মৃত্যুঞ্জয়ী ভ্যান ত্রোই

কালিপদ দাস

এ ৬৪, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা-৭

প্রথম সংস্করণ
সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮

প্রকাশক
মজহারুল ইসলাম
নবজাতক প্রকাশন
এ ৬৪, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭

মুদ্রক :
মলয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৬, নং নবীন কুণ্ডু লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ শিল্পী :
খালেদ চৌধুরী

এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার যে সব তরুণ-তরুণী
সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জীবনের শেষ রক্তবিন্দু
ঢেলে দিয়েছেন ও দিচ্ছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে—

লেখক

লেখকের কথা

"এমন মৃত্যুও আছে যা মানুষকে অমরত্ব দান করে,"—নুয়েন ভ্যান ত্রোইর মৃত্যু প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে লিখেছিলেন কবি তো হু। এর চেয়ে বেশি সত্যি আর কিছু হতে পারে না। এই তরুণ সায়গনের বিদ্যুৎকর্মী, যিনি মৃত্যু মুহূর্তেও তাঁর ঘাতকদের অন্তরাত্মাকে কাঁপিয়ে তুলেছিলেন, তাঁর ছবি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জনগণের স্মৃতিপটে চিরদিন অম্লান হয়ে থাকবে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রামে জনগণের চরম বিজয়লাভ পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ দক্ষিণ- ভিয়েত-নামবাসী নুয়েন ভ্যান ত্রোইর স্থান গ্রহণ করে চলেছে।

নুয়েন ভ্যান ত্রোইর স্মৃতি আমাদের তরুণদের বাহুতে আনে সিংহের বল, তাঁদের সংকল্পে আনে ইস্পাতের দৃঢ়তা আর তাঁদের অনুপ্রাণিত করে তোলে অপরিমেয় শক্তিতে। একথা যুদ্ধক্ষেত্রে সত্যি, সত্যি কলকারখানায়, সত্যি ধানের ক্ষেতে—সত্যি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। নুয়েন ভ্যান ত্রোই মৃত্যুর মাঝে অমর। আমরা কর্মক্ষেত্রে যাই বা যুদ্ধক্ষেত্রে যাই—যেখানেই যাই তাঁর স্মৃতি আমাদের সর্বক্ষণের সাথী হয়ে থাকে; শুধু ভিয়েতনামেই নয়, লাওস, কম্বোডিয়া সহ দুনিয়ার সর্বত্র সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জনগণের হৃদয়ে নুয়েন ভ্যান ত্রোইর স্মৃতি চিরদিন ভাস্বর হয়ে থাকবে।

কালিপদ দাস

সেই সময়ে ভগিনী কুয়েনের প্রায় এক মুহূর্তেরও বিশ্রাম ছিলনা। 'ন্গুয়েন ভ্যান ত্রোইর স্ত্রী দক্ষিণ ভিয়েতনামী নারী মহাসভায় যোগ দেবার জন্য এসেছে'—এ খবর যখন একবার রটে গেল তখন সমস্ত অঞ্চল এবং প্রদেশের প্রতিনিধিরা দলে দলে আসতে লাগল তার সম্বন্ধে জানার কৌতূহল নিয়ে। পশ্চিম অঞ্চলের একজন নারী গেরিলাযোদ্ধা দৌড়াতে দৌড়াতে এসে হাজির সায়গনের প্রতিনিধি দলের আস্তানায়। আবেগে থরো থরো গলায় সে বললে, "পুরো একমাস ধরে আমাদের জেলার লোকেরা ভ্রাতা ত্রোইর হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য মরিয়া হয়ে লড়াই করেছে। আমি নিজে আহত হয়েছি সেই লড়াইয়ে। আমরা চাই ভগিনী কুয়েন আমাদের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে একদিন থাকুন, থেকে আমাদের তাঁর বীর স্বামীর কাহিনী শোনান। এখান থেকে ফিরে আমরা যখন আবার আমাদের দুষমনদের খতম করার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ব তখন এই কাহিনী আমাদের প্রাণে নতুন প্রেরণা যোগাবে।" পঞ্চম অঞ্চলের এক মা গভীর স্নেহের সঙ্গে কুয়েনকে বললেন, "ত্রোই কোয়াংনামের ছেলে; সেই হিসেবে তুমি পঞ্চম অঞ্চলের লোকদের বৌমা। তুমি যদি আমাদের কাছে এসে থাক তাহলে আমরা খুবই খুশী হবো।"

এরপর ভগিনী কুয়েন আর একটা মাত্র জায়গায় স্থির হয়ে থাকতে পারল না: প্রথমে এ প্রতিনিধি দলের সঙ্গে কিছু সময়, তারপর ও প্রতিনিধি দলের সঙ্গে কিছু সময়—এমনি করেই তার সময় কেটে গেল। ফলে, তার স্বামীর প্রশংসনীয় মহান জীবন-কাহিনী লিপিবদ্ধ করার জন্যে তার সঙ্গে বসে যে একটা সারা সকাল বা বিকাল ধরে কথাবার্তা বলব—যেমন হয়েছিল সায়গন থেকে তার পালাবার ঠিক পরের দিনগুলোতে—তা আর আমার পক্ষে সম্ভব হলো না। তবে সে আমাকে কথা দিয়েছিল যে মহাসভার প্রতিদিনের অধিবেশনের পরে সন্ধ্যে বেলায় আমার সঙ্গে দেখা করবে; আমাকে শোনাবে ত্রোই-এর সঙ্গে ওর শেষ যে ক'টা দিন কেটেছিল তার কথা—শোনাবে জেলখানা আর মৃত্যু দণ্ডপ্রাপ্ত বন্দীদের সেলে স্বামীর সঙ্গে শেষ যে ক'বার তার দেখা হয়েছিল তার মর্মস্পর্শী কাহিনী।

সেটা ছিল ১৯৬৪ সালের ১০ই মে, রবিবারের সকাল। আমার মন উৎকণ্ঠায় অত্যন্ত অধীর হয়ে উঠেছিল। আগের দিন সারা রাত ত্রোই বাড়ি ফেরেনি। এর আগের যে কোন রবিবারের থেকে ওর জন্যে আমার মনটা অনেক বেশি কেমন যেন করছিল। আমাদের বিয়ের পর থেকে আজ পর্যন্ত আমরা কোন আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে যেতে পারিনি। আমার বাবা মা উত্তরের

লোক, তাঁদের আদি বাড়ি ছিল হাডং প্রদেশের থুয়ংটিন জেলার ভ্যান পিয়াপ কমিউনে। অনেক বছর আগে সেখানকার আরও অনেক অধিবাসীর সঙ্গে তাঁরা দক্ষিণে চলে আসেন। কিন্তু দক্ষিণে এসেও তাঁরা সকলেই তাঁদের দেশী রীতি-নীতি বজায় রেখে চলেছিলেন। তার মধ্যে একটা রীতি ছিল নতুন বর-বৌ বিয়ের পরদিনই বৌয়ের বাপের বাড়ি যাবে দেখা সাক্ষাৎ করতে। আমাদের বিয়ের পরে কয়েক সপ্তাহ কেটে গিয়েছিল; কিন্তু ত্রোই না-যাবার জন্যে একটা না একটা ছুঁতো সব সময়েই খুঁজে বার করেছে। এই রবিবারেও ও কোন একটা কাজে ব্যস্ত থাকবে নাকি?

আমার সত্যিই বেশ একটু রাগ হয়েছিল। কী এমন জরুরী কাজ যে ও একদিনের জন্যেও ছুটি পায় না। আমাদের দু'জনের জন্যে দু'জনের, ভালোবাসার অন্ত ছিল না। বিয়ের আগে ও যখনই আমাদের আসল বিয়ের কথা বলত, তখনই দেখতুম ওর খুশী আর ধরছে না। ও বলতো, "ঐ দিনটা হবে আমাদের সবচেয়ে আনন্দের দিন! মানুষের জীবনে এরকম একটা দিন একবারই মাত্র আসে। তাই ঐ দিনটা আমরা এমন করে কাটাব যেন চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকে। অনেক লোকজনকে নেমন্তন্ন করব বিয়েতে আসার জন্যে।"

তারপরের কয়েকটা দিন একদম ছুটি—সে দিনগুলো হবে শুধু তোমার আর আমার—সে ক'দিন শুধু মনের আনন্দে বেড়িয়ে বেড়িয়ে কাটাব আর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের বাড়ি যাব দেখা সাক্ষাৎ করতে। কিন্তু বিয়ের দিন যখন এল তখন ও আর তার কথা রাখলো না। এমন কি চুলটুলগুলো কেটে ছেঁটে যে একটু সভ্যভব্য হবে তাও হলো না। আর বিয়ের পরে ওর কাজকর্ম যেন আরও বেড়ে গেল, তখন ও কাজ থেকে প্রায় প্রতিদিনই দেরী করে বাড়ি ফিরতে লাগল। আর বাড়ি ফিরেও কাজের বিরাম নেই; তখনও অনেক রাত পর্যন্ত জেগে জেগে চলত হরেক রকমের নক্সা তৈরি। এর মধ্যে যদিবা কখনো-সখনো আমাকে নিয়ে কোন বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে যেত, সেখানেও আমাকে একা একা এক পাশে বসিয়ে রেখে তারা দু'বন্ধুতে উঠোনে গিয়ে গল্প জুড়ে দিত। আর সে কি গল্প! যেন আর ফুরোতেই চায়না। তার মধ্যে আবার দেখতুম—দাবাড়েরা যেমন করে বোড়ের চাল দেয় তেমনি করে মাঝে মাঝে তারা ছোট ছোট পাথরের টুকরো সরিয়ে সরিয়ে বসাচ্ছে। একবার আমি ওকে জিগ্যেসই করে বসলুম, "তোমার কাঁধে তো দেখি অনেক সমস্যার বোঝা?" উত্তরে ও বললে, "আর বল কেন? আমাদের মালিক আমাকে একটা খটমটে বৈদ্যুতিক

যন্ত্র সারাবার ভার দিয়ে বসে আছে। কিন্তু কাজটা যে ঠিক কিভাবে শুরু করব মাথামুণ্ডু কিছুই এখনও বুঝে উঠতে পারলুম না।” এরপর হঠাৎ একদিন দেখি বিয়ের আঙ্‌টিটা ওর আঙ্গুল থেকে উধাও হয়েছে। আঙ্‌টিটার ওপর ইংরেজী ‘কিউ’ অক্ষরটা খোদাই করা ছিল। ১৯৬৪ সালের চান্দ্র নববর্ষের দিন আমি ওটা ওকে উপহার দিয়েছিলুম। ও বললে, আঙ্‌টিটার জন্যে ওর কাজের খুব অসুবিধে হচ্ছিল, তাই খুলে রেখেছে। শুনে আমি একেবারে অবাক হয়ে গেলাম। আমি যখন আঙ্‌টিটা ওকে দিয়েছিলাম, তখন মনে হয়েছিল ও একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছে, যেন পবিত্র কিছু একটা পেয়ে গেছে এমনি ভাব। বার বার করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল। তারপর আঙুলে পরে পরে দেখল যাতে কাজের সময় খুলে পড়ে না যায়। শেষে এটাকে আঙুলে গলিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে একটু পরিহাস করে বললে, “একমাত্র যদি কখনও কাজ করার সময় কোন দুর্ঘটনা ঘটে এই আঙুলটা কেটে আলাদা হয়ে যায়, তাহলেই এটা আমার হাত থেকে যাবে, তা না হলে এটা কখনও আমার হাত ছাড়া হবে না।”

আমাদের বিয়ের আগে মনে হত যেন ও আমাকে উন্মত্তের মত ভালবাসে। আমাদেরই কারখানায় কাজ করত একটা মেয়ে—সম্পর্কে ওর বোন; সে-ই আমাদের দু’জনের পরিচয় করে দিয়েছিল। প্রত্যেক দিনই বিকেলে কাজের ছুটির পরে কারখানা থেকে বেরিয়ে দেখতুম ও আমার জন্যে অপেক্ষা করছে,—সে রোদ ঝলমলে দিনই হোক আর ঝড় বাদলের দিনই হোক। একবার সে দু’সপ্তাহের জন্যে কোয়াংনামে তার নিজের গাঁয়ে গিয়েছিল। সেই সময় ও আমাকে দু’টো চিঠি লিখেছিল,—তার কোনটাই দু’এক পাতায় শেষ হয়নি। আর সে চিঠি দু’টো পড়ে আমার মনে হয়েছিল যেন কত কালই না আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়েছে! তার চিঠি পড়তে আমি কি ভালই না বাসতুম,—প্রতিটা লাইন আমার মুখস্থ হয়ে যেত। কি বিশ্বস্তই না ছিল ও, আমাকে কি গভীর ভাবেই না ভালবাসত! আর আমাদের পরিবারের সকলেও ওকে খুব সম্মানের চোখে দেখত। এরকম একজন মনের মানুষ পেয়ে মনে আমার গর্ব আর ধরত না। আরও অনেক তরুণ আমাকে ভালবাসা জানিয়েছে, কিন্তু ও ছিল তাদের থেকে একেবারে অন্য প্রকৃতির। ও কখনও আমার তোষামোদি করত না: ওর ভালবাসা ছিল গভীর আর আন্তরিক, আর সেই সঙ্গে ছিল মর্যাদাময় আর অকপট। আমার কথাবার্তা, আচার-ব্যবহারের মধ্যে যদি ও খুব সামান্য দোষত্রুটিও দেখতে পেত যাকে ও বিচার বিবেচনাহীনের মত কাজ বলে মনে

করে তাহলে ও আমাকে রেহাই দিত না। মাঝে মাঝে আমি রেগে উঠতাম। তখন ও বলত, "আমি শুধু চাই তুমি আরও, আরও ভালো মেয়ে হয়ে ওঠ; আমরা একে অপরকে যতই বেশী করে ভালবাসব, ততই তো আমাদের প্রত্যেকের উচিত হবে অপরজন যাতে আরও উঁচুদরের মানুষ হয়ে উঠতে পারে তার চেষ্টা করা।" কিন্তু ইদানিং কেন যে সে ঐ রকম অদ্ভুত ব্যবহার করছিল কিছুতেই আমি তা বুঝে উঠতে পারছিলুম না। কথাবার্তা বলা প্রায় একেবারেই বন্ধ করে দিয়েছিল। কি কারণে যে ওর আচার ব্যবহার এমনি করে হঠাৎ বদলে গেল তা খুঁজে বের করবার জন্যে আমি ধৈর্যের সঙ্গে চেষ্টা করতে লাগলুম। একথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে প্রতিদিনকার জীবনে আমার প্রতি তার আদর যত্নের মাত্রা এক তিলও কমেনি বরং আগের থেকে বেড়েই গিয়েছিল। একদিন আমার শরীরটা একটু খারাপ করেছিল, দুপুরের পরে আর কাজে যেতে পারিনি। তারই জন্যে ভাবনায় চিন্তায় ও একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল; আর ওষুধপত্রের ব্যাবস্থা করার জন্যে সে কি ছুটোছুটি—যেন আমার কি সাংঘাতিকই না অসুখ করেছে। তারপর কি গভীর স্নেহভরেই না সেবাযত্ন করল আমার। ভাতের মণ্ড তৈরি করে, ফলমূল ছাড়িয়ে খাওয়াল, তারপর অনেক রাত পর্যন্ত জেগে জেগে পাখার বাতাস করে আমায় ঘুম পাড়াল। এইতো আগের দিনই—বাইরে বেরুবার আগে ও আমার স্নানের বন্দোবস্ত করে দিল। একটা বালতি জলে ভর্তি করে পাশের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে দিয়ে এল। আমাদের নিজেদের কোন স্নানের ঘর ছিল না। আমরা আমাদের পড়শীদেরটাই ব্যবহার করতুম, কিন্তু শনিবার সন্ধ্যেবেলাও যখন দেখতুম ও বাইরে বেরুবার জন্যে তৈরি হচ্ছে তখন আমার রাগ ধরে গেল। বেশ একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই বলে উঠলুম, "যদি যেতেই হয় তো এখইনই বেরোও। জল আমি নিজেই বয়ে নিয়ে আসতে পারব।"

"না-না, কয়েকটা ধাপ বেশ উঁচু উঁচু; তুমি পড়ে যেতে পার," দরজার কাছে পৌঁছে মোটর বাইকের ওপর একটা হাত রেখে ও ফিরে দাঁড়াল; বললে, "মেশিনটা সারান শীগ্‌গিরই শেষ হয়ে যাবে, বুঝলে। কালকেই হয়তো তোমাকে নিয়ে বেড়াতে বেরুতে পারব। বল দেখি কোথায় যাওয়া যায়। আর যদি চাও তো দু'একদিনের জন্যে দূরেও কোথাও যাওয়া যাবে'খন।"

আমি তাই নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছিলুম যে এই রবিবারে ও নিশ্চয়ই বাড়ি চলে আসবে, আর আমি ওর সঙ্গে বেড়াতে বেরুতে পারব। আমি একটা গাউন বের করে রাখলুম যেটা আমি বিয়ের সময় পরেছিলাম। তারপর ভাবতে বসলুম

আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে কার কার বাড়ি প্রথমে যাওয়া যায়। তাছাড়া কয়েকজন বান্ধবীর সঙ্গেও দেখা করতে যেতে হবে ত্রোইকে নিয়ে; অনেকদিন ধরেই ওরা আমাকে ক্ষেপাচ্ছে, বলছে, "তোর বরটা একটা ইঁদুরের মত ভীতু, কোথাও মুখ দেখাতে সাহস করে না।"

তখন সকাল ন'টার মত হবে। হঠাৎ সাত আটজন পুলিশ একটা লোককে টানতে টানতে এনে হাজির করল। লোকটার হাতদু'টো পিছমোড়া করে বাঁধা—হাতকড়া লাগান। প্রথমে ত্রোইকে আমি একেবারে চিনতেই পারিনি। কিন্তু আমাকে দেখেই ও চেঁচিয়ে উঠল, "কুয়েন, আমি ধরা পড়ে গেছি।" আস্তে আস্তে ও আমার আছে এগিয়ে এল, কিন্তু আমি এক পাও নড়তে পারলাম না—যেন পাথর হয়ে গেছি। একটা মাত্র রাত তো ও বাইরে ছিল; কিন্তু ওকে দেখে মনে হচ্ছিল ও যেন ত্রোই নয়, একেবারে অন্য কোন লোক। তার কাপড় চোপড় রক্ত আর কাদায় মাখামাখি হয়ে আছে, ওগুলোর রঙ যে নীল, দেখে তা বোঝার আর কোন উপায়ই নেই। চোখমুখ বসে গেছে, একমাথা চুল এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে; আর সারা মুখে কাটাকুটি আর কালসিটে দাগ। পুলিশগুলো নিষ্ঠুর ভাবে ধাক্কা মেরে ওকে ভেতরে নিয়ে এল, এনে বসিয়ে দিলে বিছানার ওপর। তাদের মধ্যে একজন, সে বোধ হয় ওদের দলপতি। কথায় তার উত্তুরে টান। লোকটা আমাদের ছোট্ট ঘরটার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলে উঠল:

"কেমন আরামের আর ছিমছাম ঘরখানা দেখতো। নতুন বর বৌয়ের পক্ষে একবারে খাসা। তবুও ব্যাটাচ্ছেলের একটা গোলমাল পাকিয়ে না তুললে চলে না।"

তারপর কয়েকটা জিনিসের ওপর চোখ রেখে আবার বললে:

"ম্যানডোলিন, নতুন জামা কাপড়—অভাব তো দেখছিনা কিছুর!"

এদিক ওদিক নজর বোলান তখনও শেষ হয়নি তার। আমার ওপর চোখ পড়তে ত্রোইকে জিগ্যেস করলে:

"আবার একটা ছুকরী বৌও তো রয়েছে দেখছি, এতেই তো তোমার যথেষ্ট সুখী হওয়ার কথা। তোমার আরও কি চাই বল তো?"

চোখের ওপর একগোছা চুল এসে পড়েছিল ওর, মাথাটা ঝাঁকিয়ে সেগুলোকে পেছনের দিকে ঠেলে দিয়ে ও জবাব দিল:

"সে কথা তো কাল রাত্তিরে আমি আপনাকে হাজারবার বলেছি। আমি

আরও যা চাই তা হোল আমার দেশ থেকে শেষ ইয়াংকীটাকে পর্যন্ত নির্মূল করতে। আমি চাই দক্ষিণকে স্বাধীন করতে।"

পুলিশ কম্যান্ডারটা একটা ছোট টেবিলের ওপর ভর দিয়ে ত্রোই-এর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল। ত্রোই-এর দিকে জলন্ত দৃষ্টি হেনে সে ভয় দেখিয়ে চেঁচিয়ে উঠল :

"দেখা যাবে কতদিন তোমার এই তেজ বজায় থাকে।"

অন্য পুলিশগুলো উঠোনে বিস্ফারকের জন্যে তল্লাসী চালাচ্ছিল। লোকটা চেঁচিয়ে ওদের হুকুম দিল, "তন্ন তন্ন করে তল্লাসী চালাও।" তারপর এগিয়ে গেল বিছানার দিকে, বললে :

"বিছানা, চাদর, বালিশ—সবই তো দেখছি একবারে আনকোরা নতুন, নরম নরম আর বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কিন্তু তবুও ঘরে থেকে এই সব সুখ ভোগ করে তোমার মন উঠল না। তার বদলে তুমি পড়লে গিয়ে ভিয়েতকংদের পাল্লায়, আর সে ব্যাটারা তোমাকে ভুলিয়ে খুন খারাপি করার কাজে লাগিয়ে দিলে। ভিয়েতকংরা অবিশ্যি গা ঢাকা দিয়েছে—ভগবান জানেন কোথায় পালাল ওরা। কিন্তু তুমি—তোমার হাতে তো হাতকড়া পড়েছে তাছাড়া আর একটু অপেক্ষা করো—অনেক ঠ্যাঙানিই আছে তোমার কপালে।"

লোকটার চোখে চোখে তাকিয়ে ত্রোই সঙ্গে সঙ্গে ওর মুখের ওপর জবাব দিল, "আমি আপনাদের মত মনোবৃত্তিসম্পন্ন লোক নই। ইয়াংকী কসাইরা যখন বোমা ফেলে, কামান দেগে, বন্দুক চালিয়ে আমার দেশের মানুষকে খুন করছে লাখে লাখে, তখন পা চাটা কুকুরের মত মাথা নুইয়ে বেঁচে থাকতে পারি না, পারি না সুখস্বাচ্ছন্দ্যের স্বপ্নে বিভোর হয়ে জীবন কাটাতে।"

বিছানার মাথার দিকে হেলান দিয়ে বসেছিল ও। একেবারে শান্ত, অবিচলিত। একপাল পুলিশ যে ওকে ঘিরে রয়েছে সে ওর গ্রাহ্যই নেই। সে তার ছোট ঘরটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। দু'বছর আগে তার ভাইপোর সাহায্যে এটা গড়ে তুলেছিল সে; তার জন্যে সে একটা একটা করে তক্তা, একটা একটা করে তালপাতা জোগাড় করেছিল।

ও আমার দিকে অনেক, অনেক ক্ষণ ধরে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। ওর দু'চোখ থেকে ভালবাসা আর স্নেহ উপচে পড়ছে। মনে হল ও আমাকে কিছু বলতে চাইছে—আমাকে সান্ত্বনা দিতে চাইছে। যতই বেশী করে আমি ওর ভালবাসা উপলব্ধি করতে লাগলুম, ততই বেশী করে আমার অন্তর বেদনায়

ভরে যেতে লাগল। কি ছেলেমানুষই না ছিলুম আমি—জীবন সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না আমার। তাই ওকে আমি বুঝতে পারিনি, তাই এখন ধিক্কার দিতে লাগলুম নিজেকে, ধিক্কার দিতে লাগলুম ওর বিশ্বস্ততায় সন্দেহ করেছিলুম বলে। এখন সব একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেছে: বিপ্লবের জন্যেই ও তার ব্যক্তিগত সব সুখ-সাধ বিসর্জন দিয়েছে। এমনকি সেই জন্যে নিজের বিয়েও পিছিয়ে দিতে চেয়েছিল। এখন আমি বুঝতে পারলুম কেন সে তখন আমাদের বিয়ে স্থগিত রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু তখন আমার সন্দেহ হয়েছিল যে ও আমার সঙ্গে সম্পর্ক কাটাতে চায়। কিন্তু ততদিনে নিমন্ত্রণ পত্র সব পাঠান হয়ে গিয়েছিল। এখন যদি বিয়ে স্থগিত থেকে যায়, তাহলে লোকে কি বলবে? আমি প্রতিবাদ করতে লাগলুম। আমাকে কিছুতেই বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজী করাতে না পেরে ও অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর বললে:

"তোমাকে যে কি করে বোঝাব, কুয়েন? ঠিক আছে, যেমন ঠিক করা হয়েছে, তেমনিভাবে বিয়েটা সেরেই ফেলা যাক। কিন্তু, দোহাই তোমার, আমার সম্বন্ধে কোনো খারাপ ধারনা করো না। তোমাকে ছেড়ে যাবার কথা কক্ষণো আমার মনে উদয় হয়নি, তোমাকে যে আমি কত ভালবাসি তা আমি কি বলে বোঝাব। এখন তুমি আমার ওপরে রেগে গেছ, কিন্তু একদিন সবই বুঝতে পারবে।"

অবশেষে আমি ওকে বুঝতে পারলুম, বুঝতে পারলুম এক প্রচণ্ড বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যখন ওরা ওর হাতে হাতকড়া পরিয়েছে তখন। দুঃসহবেদনায় ঘরের এককোণে বসে চোখের জলে বুক ভাসাতে লাগলুম।

পুলিশগুলো মাইন-ধরা যন্ত্র (Mine Detector) নিয়ে বহুক্ষণ ধরে বাড়িতে, বাইরে উঠোনে সর্বত্র তন্নতন্ন করে তল্লাশী চালাল, কিন্তু কোন বিস্ফোরক খুঁজে পেল না। তখন তারা সকলে ঘরের মধ্যে ঢুকে ত্রোইকে ঘিরে দাঁড়াল। তাদের দলপতি আমাকে জিগ্যেস করল:

তোমার স্বামী কোথাও কোন বিস্ফোরক লুকিয়ে রেখেছে জানো? বাড়ির মধ্যে কখনও কিছু লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করতে দেখেছ?"

আমি কাঁদতে কাঁদতে উত্তর দিলুম:

"আমার স্বামী কি করেন না করেন, আমি তার কিছুই জানি না। আমি কখনও তাকে কিছু লুকিয়ে রাখতে দেখিনি।"

তুমি যদি সব খুলে না বল, তাহলে তোমার স্বামীকে এই ঘরের মধ্যেই ঠেঙিয়ে শেষ করে ফেলব।

"আমি যা জানি না তা কি করে বলব ?"

তখন সে ত্রোই-এর দিকে ফিরল :

"তুমি বিস্ফোরক লুকিয়ে রেখেছ তা যদি আমাদের বল, তাহলে তোমাদের এই ঘর চিরকাল সুখের নীড় হয়ে থাকবে, আর যদি তুমি অস্বীকার করতেই থাক, তাহলে এই ঘরটাই পরিণত হবে নির্যাতন কক্ষে, আর সেই নরকে মরবে তুমি।"

"বিস্ফোরক কোথায় আছে জানি না।"

সঙ্গে সঙ্গে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর, মারতে শুরু করল বর্বরের মত। তারপর ওকে দিতে লাগল বৈদ্যুতিক শক। সে শকগুলো এতো প্রচণ্ড ছিল যে ও বিছানার ওপর আছড়ে আছড়ে পড়তে লাগল, যন্ত্রণায় ওর সারা শরীর দুমড়ে মুচড়ে যেতে লাগল। আমি আর স্থির থাকতে পারলুম না। সব ভয় আমার অন্তর থেকে নিঃশেষে মুছে গেল। বদমায়েসগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে আমি ওদের বাধা দেবার চেষ্টা করলাম ওদের মধ্যে একজন আমাকে ধরে ফেলল, তারপর টেনে, হিঁচড়ে চেয়ারের কাছে এনে, ঘাড় ধরে চেপে বসিয়ে দিল, সামনে দাঁড়িয়ে রইল পাহারায়। আমি চিৎকার করতে লাগলাম। ওরা ওদের পিস্তল বের করে আমার দিকে তাক করে ধরল। এরপর ওরা মারধোর একটু থামাল; থামিয়ে ত্রোইকে আবার জিগ্যেস করল :

"বল বিস্ফোরকগুলো কোথায় ?"

তখন ও প্রচণ্ডভাবে হাঁকাচ্ছে; তবুও আগের থেকে আরও জোরে চিৎকার করে জবাব দিল :

"আমি আগেই বলেছি যে আমি জানি না। তবুও যদি তোমরা জানতে চাও তো শোন—ইয়াংকীরা যেখানে সেখানেই আছে বারুদের স্তূপ।"

এইবার পুলিশ কম্যাণ্ডারটা নিজেই মারতে শুরু করলো। বদমায়েসগুলোর একটার হাত থেকে একটানে ছড়িটা টেনে নিয়ে ত্রোইকে পেটাতে শুরু করল, তার সারা শরীরে আঘাত এসে পড়তে লাগল বৃষ্টি ধারার মত। প্রতি দফার মারের পর দস্যুগুলো ওকে জেরা করতে লাগল। এমনি করে একঘণ্টা পার হয়ে গেল, কিন্তু ওরা ওর মুখ থেকে একটা কথাও বের করতে পারলো না। এই ভাবে নিরাশ হয়ে কম্যাণ্ডারটা শেষে ওর লোকগুলোকে হুকুম দিল, "নিয়ে যাও হতভাগা-টাকে।" অনেক কষ্টে দু'পায়ের ওপর খাড়া হয়ে দাঁড়াল ও; তারপর বেশ জোর গলাতেই আমাকে ডেকে বললে :

"কোনও চিন্তা কোরো না কুয়েন। আমাদের ভাইপো আর তুমি দু'জনে মিলে যা হোক্ করে চালিয়ে নিও।"

তার জামাকাপড় সব ছিঁড়ে ফালা ফালা হয়ে গেছে; একটা বোতামও টিকে নেই। ওর বুক, ওর মুখ—ওর সর্বশরীর থেকেই রক্ত ঝরছে। ধীরে ধীরে ও দরজার দিকে এগিয়ে গেল, কিন্তু তখনও ও তাকিয়ে আছে আমার দিকে, আর চেষ্টা করছে জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে, এইবার আমার স্বামীর কাছে যাবার জন্যে আমি মরিয়া হয়ে উঠলাম, যে পুলিশটা আমায় পাহারা দিচ্ছিল তার সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু করে দিলাম। জানোয়ারটা আমার ঘাড় চেপে ধরে ছিল। তা সত্ত্বেও আমি চেঁচিয়ে বলে উঠলাম: "আমি তোমাকে ভালবাসি, ত্রোই, আমি তোমাকে আমার প্রাণের চেয়েও ভালবাসি।"

কম্যাণ্ডারটা আমার দিকে ফিরে বলল:

"ওসব সোহাগের কথা, মায়ার কথা ভুলে যাও, এখন থেকে বরং আর একটা স্বোয়ামীর খোঁজ শুরু করে দাও। শয়তানের বাচ্চাটা যে অপরাধ করেছে, তাতে ওকে আর মরণের হাত এড়াতে হবে না।"

সেইদিনই রাতে, রাত তখন এগারোটার মত হবে, পুলিশগুলো আবার এসে হাজির। এসে আমাকে বললে: "তোমার স্বামী তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়, আর তা এক্ষুণি"। ওকে আবার আমি দেখতে পাব—একথাটা শুনেই আমি তাড়াতাড়ি ওদের সঙ্গে বেরিয়ে এসে ওদের গাড়ীতে উঠলাম। ওরা ওকে কোথায় রেখেছে তা যদি জানতে পারি, তা হলে আমি ওর দেখা-শোনা করতে পারব, ওর জন্যে খাবার-দাবার আনতে পারব। একটু পরেই ওরা গাড়ী নিয়ে একটা গলির মধ্যে ঢুকল, সেখানে একটি স্কুলের মেয়েকে গ্রেপ্তার করল। তারপর আমাদের দু'জনকে নিয়ে গিয়ে হাজির করল শহরের পুলিশ সদর দপ্তরে। জেরা করার ঘরে জানতে পারলুম সন্দেহ করা হচ্ছে যে মেয়েটাও ত্রোইর কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত আছে। সেই রাত্তিরেই আমাকে জেরা করা শুরু হলো। শুরু করল একজন পুলিস সুপারিনটেনডেণ্ট:

"তোমার স্বামীর কার্যকলাপ সম্বন্ধে কিছু জান?"

"না, কিছু জানি না।"

"কতদিন তোমাদের বিয়ে হয়েছে?"

"ঠিক উনিশ দিন।"

"বুঝতে পার নিশ্চয়ই যে তোমার আর ত্রোইর মতো যাদের নতুন বিয়ে

হয়েছে, তাদের পক্ষে এই দিনগুলোই হবে জীবনের সবচেয়ে মধুর, সবচেয়ে আনন্দের দিন।"

"হ্যাঁ, তাতো বুঝিই, খুব ভাল করেই বুঝি সে কথা।"

"বাঃ এইতো! তুমি যদি কিছু গোপন না করে সব খুলে বল, তাহলে তোমাদের জীবনের এই সব চেয়ে মধুর, সবচেয়ে আনন্দের দিনগুলোতে আর ছেদ পড়বে না সারা জীবন।"

এইখানে লোকটা থামল, হাই তুলল, তারপর তার হাতলওয়ালা চেয়ারে শরীরটাকে এলিয়ে দিল। ইঁদুরের মত তার মুখটা, আর আফিং খোরের মতো তার মুখের রঙ।

সে আবার শুরু করল:

"কাদের সঙ্গে ত্রোই ঘনঘন দেখা সাক্ষাৎ করতে যেত?"

"ও তো সারা দিনই কাজ নিয়ে পড়ে থাকত। এমন কি কখন কখন সন্ধ্যের পরেও কাজ করত। বাইরে টাইরে বেরোত না বল্লেই চলে। মাঝে মাঝে হয়ত একদিন রাস্তায় একটু ঘুরে টুরে এল। আমার তো মনেই হয় না 'ও কারও সঙ্গে ঘন ঘন দেখা সাক্ষাৎ করতে যেত। আর যদি সত্যিই গিয়ে থাকে আমি তার কিছুই জানি না।"

"ওর সঙ্গে কি কেউ ঘন ঘন দেখা সাক্ষাৎ করতে আসতো?"

"খুব মাঝে মাঝে দু'একজন আসতো, তখন 'ওরা সব একসঙ্গে মিলে গান বাজনা করত কিংবা টুকরো টাকরা সারাই-টারাইয়ের কাজ 'ওরা যা পেত সেই সব কাজ নিয়ে বসত। আমার সঙ্গে ওর বিয়ে হয়েছে তো এই কয়েকদিন মাত্র। এর মধ্যে তার বন্ধু-বান্ধবদের সম্বন্ধে বেশী খবর আমি কি করে জানব।"

"চেষ্টা কর। মনে করার চেষ্টা কর। তুমি যা কিছু জান সব খুলে বল। ভাল করে সব ভেবে দেখ। তুমি যদি কিছু গোপন না কর তবে ও মুক্তি পাবে। ত্রোইর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, এখন তোমার সঙ্গেও দেখা হলো। সত্যি কথা বলতে কি তোমাদের দু'জনের চমৎকার জোড় মিলেছে। তোমাদের জন্যে আমার সত্যিই বড় দুঃখ হয়।"

লোকটা আমার আর ত্রোইর একটা ফটো আলতো করে ছুঁড়ে ফেললো ডেকস্‌টার ওপর। ফটোটা আমাদের বিয়ের দিন তোলা। তাতে আমি নীল-রঙের ফুলের ছাপওয়ালা কাপড়ের একটা গাউন পরে আছি, হাতে এক গোছা

গ্ল্যাডিওলি ফুল, আর ত্রোই আমার পাশে দাঁড়িয়ে। পুলিস সুপারটা প্রাণপণ চেষ্টা করে গলায় একটা দরদের সুর ফুটিয়ে তুললে :

"সত্যি, এরকম একজোড়া অল্প বয়সী স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে শিগগিরই চিরকালের মত ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে, একথা ভাবতে অতি বড় পাষণ্ডেরও প্রাণ কেঁদে ওঠে। এই কাজে আমি বহুদিন ধরে আছি; আর বহু পরিবারের সুখ-শান্তিই আমি রক্ষে করেছি। তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পার। ত্রোইদের দলের পাণ্ডা কারা, তার সঙ্গীই বা কারা, আর গোলাবারুদই বা ওরা কোথায় লুকিয়ে রেখেছে—এসব খুঁজে বের করতে যদি তুমি আমাদের সাহায্য কর, তাহলে আমি কথা দিচ্ছি—তোমাদের আবার মিলন হবে...... ।"

আমি বললাম : "ও ব্যাপার-স্যাপার আমি কিছুই জানি না। কারখানা আর গেরস্থালীর কাজকর্ম নিয়েই আমার দম ফেলার সময় থাকে না। আমি ব্যাচ তুয়েত কটন উল প্যাকিং ফ্যাকটরীতে (Bach Tuyet Cotton Wool Packing Factory); কাজ করি—আপনি যদি একবার মাত্র সেখানে ঘুরে আসেন তাহলেই বুঝতে পারবেন আমি কি বলতে চাইছি। এমন কি রোববারেও আমাকে কাজ করতে হয়। আর সপ্তাহের অন্য ছ'দিন তো একটানা বার ঘণ্টা কাজ করতে হয় আমাকে।"

পুলিশ সুপারের আমাকে আর ছাত্রীটিকে জেরা করা আর কিছুতেই শেষ হয় না। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কেবলই সেই একই প্রশ্ন—ত্রোইর সঙ্গে কোথায় কার যোগাযোগ ছিল তাই বের করার চেষ্টা। মাঝ রাত্তিরে লোকটা আমাদের নির্যাতন কক্ষ দেখাতে নিয়ে গেল। সেখানে সে আমাদের নির্যাতন করার যন্ত্রপাতিগুলোকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখিয়ে তবে ছাড়ল : ছাদের থেকে দড়ি ঝুলছে, তাতে বন্দীদের বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়; ক্যানভাসের থলে রয়েছে—নির্যাতনের ফলে কেউ মরে গেলে তার লাশ এই থলেতে ভরে রাখা হয়; রয়েছে সাবানের গুঁড়ো—জলের সঙ্গে মিশিয়ে তা বন্দীদের জোর করে গেলানো হয়; নানা মাপের পিন রয়েছে—বন্দীদের আঙুলের নখের নিচে ফোটান হয় সেগুলো; জলের মধ্যে ডুবিয়ে ডুবিয়ে অত্যাচার-নির্যাতন (water torture) করার জন্যে রয়েছে একটা চৌবাচ্চা, এমনি আরও কত কি।

লোকটা ভয় দেখানোর সুরে বলে উঠল :

"যদি তোমরা আমাদের ধোঁকা দেবার চেষ্টা কর তাহলে এ সবই তোমাদের ওপর প্রয়োগ করা হবে।"

সকাল প্রায় দু'টোর সময় আমাদের আবার জেরা করবার ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। উৎকণ্ঠায় আমার প্রাণ অস্থির হয়ে উঠেছিল। আমরা যখনই একটা ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলুম, তখনই আমি ভেতরে উঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করছিলুম। কিন্তু কোথাও আমি ত্রোইকে দেখতে পেলুম না। আমি পুলিশ সুপারটাকে জিগ্যেস করলুম :

"আমাকে এখানে আনার সময় আপনারা আমাকে বলেছিলেন যে আমার স্বামী আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। কোথায় তিনি ?"

লোকটা উত্তর দিলে :

"জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে গতকাল দুপুরে ওকে এখানেই রাখা হয়েছিল। আমরা চেয়েছিলুম সরকারের "সমবেত করার" নীতিটা (rallying policy) ওকে ব্যাখ্যা করে বোঝাব ; বুঝিয়ে বলব যাতে ও ওর অপরাধের জন্যে অনুশোচনা করে ; আর ভিয়েৎকংদের দল ছেড়ে সরকারের পক্ষে এসে যোগ দেয়। ও যদি তাতে রাজী হত তাহলে কালই তোমাদের মিলন হয়ে যেত। কিন্তু, আমরা একটা কথা মুখ থেকে খসাতে না খসাতেই ও জানালা দিয়ে নিচে লাফিয়ে পড়ল আর তাইতো ভাঙ্গল একটা পা। এখন ও আছে চো রায় হাসপাতালে।

আমি কেঁদে চিৎকার করে উঠলাম :

"তোমরা ওকে মার ধোর করে ওর পা ভেঙে দিয়েছ, আর এখন লোককে মিথ্যে করে বোঝাবার চেষ্টা করছ যে ও জানালা থেকে লাফিয়ে পড়ে...... ।"

লোকটা আমাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলে :

"মাঝ রাত্তিরে এরকম হৈ চৈ শুরু করো না। আমি তোমাকে সত্যি কথাই বলেছি। শিগগিরই তুমি নিজেই তা জানতে পারবে। কেউই তোমার কাছ থেকে কিছু লুকোতে যাচ্ছে না।"

"যদি আমার স্বামী হাসপাতালেই গিয়ে থাকেন, তা হলে আমাকে বাড়ি চলে যেতে দিন।"

"যাবার সময় হলেই জানতে পারবে।"

মাত্র তাখনই আমি বুঝতে পারলুম যে আসলে আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এইভাবে আমাকে পুলিশ সদর দপ্তরে আটকে রাখ হলো, এমনকি আমার কাপড়-চোপড় বিছানা-পত্তর আনার জন্যেও আমাকে বাড়ি যেতে দিলেনা। প্রত্যেকদিনই জেরার সময়ে জোর করে আমাকে হাজির থাকতে বাধ্য করত। সেই সময়ে

ম্যাকনামারাকে হত্যার চেষ্টায় জড়িত বলে সন্দেহ করে যাদের ধরে এনেছিল তাদের জেরা করত আর নিষ্ঠুর ভাবে মার ধোর করত।

সবচেয়ে নিষ্ঠুরভাবে যার ওপর নির্যাতন করত সে হল লোই, ত্রোইর সাথে এক সঙ্গেই ও ধরা পড়েছিল। ত্রোই যেদিন পালাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হল, সেইদিনই সন্ধ্যে বেলা লোই তার হাতকড়া ভেঙে, জেলের পাচিল টপকে পালায়। কিন্তু পরে ও আবার ধরা পড়ে। তাকে আমি এখন এই প্রথম দেখলাম। মোটে বছর আঠার বয়স হবে তার। ত্রোইর আর তার বাড়ি ছিল একই গ্রামে। যখন লোইকে প্রথম জেলখানায় নিয়ে এল তখন ওর ভাবভঙ্গী ওর সহ বন্দীদের আদৌ পছন্দ হয়নি। তার একমাথা কোঁকড়ান বাবরী চুল ঢেউয়ের মত নেমে গেছে কাঁধ পর্যন্ত আর খানিকটা ঝামরে পড়েছে ওর কপালের ওপর। এতে করে ওকে দেখাত রাস্তার একটা বখাটে ছেলের মত। কিন্তু, শিগগিরই ওরা তাকে আরও ভাল করে চিনতে পারলেঃ ও একটা নাপিতের দোকানে কাজ করত। মালিকের নির্দেশে তাকে অমনি করে বাহারী ছাঁদে চুল ছাটতে হত দোকানের খদ্দের টানবার জন্য। যখন ওরা জানতে পারল যে ম্যাকনামারার ব্যাপারে ওরও হাত ছিল, তখন ওরা ওকে সত্যি সত্যি ভালবাসতে শুরু করল। সেই সঙ্গে শুরু করল তার দেখা শোনা করতে। জেরা করার ঘরে লোইকে বর্বরের মত লাঠি পেটা করা হলো। লোইর জন্যে বেদনায় আমি কাঁদতে শুরু করলাম। আমার কান্নার আরও একটা কারণ ছিল—আমি বুঝতে পেরেছিলুম যে ত্রোইর ওপর যে নির্যাতন করা হয়েছে তা নিশ্চয়ই এর থেকে আরও অনেক বেশী জঘন্য ধরণের। ওরা লোইকে নির্দয়ভাবে ঠ্যাঙাল, কিন্তু একটা কথাও ওর মুখ থেকে বের করতে পারল না। শেষে যখন ও অজ্ঞান হয়ে পড়ল, তখন ওরা ওকে ঘরের এক কোনে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। পরে তার সঙ্গে আমার কয়েক মিনিটের জন্য আবার দেখা হয়েছিল, তখন আমরা দু'জনেই খাবার আনতে বেরিয়েছিলুম। তাড়াতাড়ি করে আমায় বললে সে, "ত্রোই ওদের বলেছে—যা কিছু করার সব ও একাই করেছে, আর কারও সঙ্গে ওর কোন রকম সংশ্রব ছিল না। সমস্ত রকমের নির্যাতন সত্ত্বেও সে শুধু এই কথাই বার বার বলতে থাকে। সত্যিকারের একজন সাহসী পুরুষ ও। যখন ও জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে তখন আমি সেখানেই ছিলাম। আমি ঠিক তার পাশেই বসেছিলুম। আমি দেখলুম ও আড় চোখে একবার পুলিশগুলোর দিকে আর একবার জানালার দিকে তাকাচ্ছে। তখনো তার হাতে হাতকড়া লাগানো; কিন্তু সেই অবস্থাতেই

ও হঠাৎ জানালা দিয়ে রাস্তায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। যদি একটা ছুটন্ত মোটর গাড়ীর ওপর না পড়ত, তাহলে হয়তো সে পালাতে পারত।…… ।"

ওদের দু'নম্বর শিকার হয়েছিল হুয়া—ত্রোইর ভাইপো। মাত্র সতের বছর তার বয়স। ত্রোই আর ও একই কারখানায় কাজ করত—সেটা হলো ফ্যাট দিয়েম ষ্ট্রীটের ন্‌গোক আন (Ngoc Anh) কারখানা—বৈদ্যুতিক মটর আর গৃহস্থালির ব্যবহারের বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি সারানোর কাজে ওটা ছিল একটা বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান। পুলিশের অজুহাত ছিল : যেহেতু খুড়ো-ভাইপো একই জায়গায় কাজ করত, অতএব ভাইপো নিশ্চয়ই তার কাকাকে এ কাজে সাহায্য করেছে ; অন্ততঃপক্ষে তার কাজ কর্ম সম্বন্ধে কিছু-না-কিছু ধারণা নিশ্চয়ই তার আছে। আমি জানি না তারা ইতিমধ্যেই হুয়াকে কতবার মারধোর করেছে কিন্তু সে বারে বারেই বলেছিল, "মালিক কাকাবাবুকে যে-কাজ দিত তিনি শুধু তাই করতেন। শুধু এইটুকুই আমি জানি, আর কিছুই জানি না।"

এক এক করে তিনদিন কেটে গেল ; অবশেষে পুলিশ সুপারটা আমাকে ত্রোইর সঙ্গে দেখা করতে নিয়ে গেল। গাড়ী ছুটে চলেছে। লোকটা রাজপথের দিকে দেখিয়ে বলতে শুরু করলে :

"তোমার ত্রোই কি নির্বোধ দেখ। মানুষ কি শান্ত শিষ্ঠ ভাবে নিজের নিজের কাজ-কর্মে যাচ্ছে, নিজেদের স্বাদ-আহ্লাদ নিয়ে কতো না সুখে আছে তারা। আর ও কিনা যোগ দিল গিয়ে ভিয়েৎকংদের কু-চক্রে। আর এখন ও এক জেলখানায় পড়ে পচছে, আর ওর স্ত্রী আর এক জেলখানায়।" লোকটা আরও অনেক কথাই বলে চলল। কিন্তু গাড়ীর ইঞ্জিনের শব্দে তার প্রায় সব কথাই ডুবে গেল। কেবল দু'টো একটা করেই মাঝে মাঝে আমার কানে এসে পৌঁচাচ্ছিল। আমরা চো রায় হাসপাতালের ফটকের কাছে পৌঁছালে আমি আমার স্বামীর জন্য তাড়াতাড়ি করে কিছু ফলমূল কিনে নিলুম।

আরও ছ'জন লোকের সঙ্গে গাদাগাদি করে একটা ছোট্ট ঘরে চাবিবন্ধ করে রাখা হয়েছে ত্রোইকে। লোহার জাল দিয়ে ঘরটা চার দিকে ঘেরা। এমনকি জানালার শার্সিগুলোতেও ঘষা কাঁচ বসানো। এমনি করে এই ছোট্ট ঘরখানাকে বাইরের সমস্ত জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে। কাছেই একটা ঘরে একদল পুলিশ পাহারায় রয়েছে। আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখে ত্রোই উঠে বসবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। শরীর ওর সাংঘাতিক রকমের দুর্বল। হাতের

ওপর ভর রেখে আবার বিছানার ওপর এলিয়ে পড়ল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই অধীর ভাবে প্রশ্ন করল :

"যাদের যাদের ধরেছিল, তারা কি সবাই ছাড়া পেয়েছে? পেয়েছে সবাই ছাড়া?"

আমি বিছানার ওপর ওর পাশে বসলুম। যদিও ওর প্রিয় বন্ধু-বান্ধবেরা এখনও জেলখানায় পচে মরছে, চরম নির্যাতন আর অত্যাচার চলছে তাদের ওপর তবুও আমি ওকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলুম; বললুম :

"তারা সবাই ছাড়া পেয়েছে, কিচ্ছু ভেবো না। আমিই কেবল বাকী আছি।"

একটা হাফ-প্যাণ্ট আর হাফ সার্ট ওর পরণে। লাঠি-পেটার লম্বা-লম্বা লাল দাগ আর ঘুসির কালশিটে দাগে ওর সারা বুক ছেয়ে আছে। ডান পা'ট গোড়ালি থেকে কোমর পর্যন্ত প্লাস্টার করা। কী দারুণ রকমের রোগা হয়ে গেছে ও। চোখ দু'টো গর্তের-মধ্যে ঢুকে গেছে। গাল দু'টো বসে গিয়ে চোয়ালের হাড় ঠেলে বেরিয়েছে। আর ওর সারা মুখ, বিশেষ করে কপালটা কাটাকুটি আর কালশিটে দাগে একেবারে ঢেকে গেছে। ওর দিকে তাকিয়ে আর কিছুতেই আমি চোখের জল ধরে রাখতে পারলুম না। ওকে জিগ্যেস করলুম :

"খুব যন্ত্রণা হচ্ছে তোমার, না?"

"না, খুব বেশি নয়, ঘুমোতে-টুমোতে পারি। ওরা তোমাকেও মারধোর করেছে নাকি?"

"না, না।"

"সত্যি বলছ?"

"সত্যি বলছি। দেখ আমার দিকে তাকিয়ে। কিন্তু আমাকে জেরা করেছে অনেক।"

ও আমার হাত দু'টো তুলে নিল নিজের হাতে। ওর দু'চোখে ভালবাসা আর মমতা টলমল করছে। কান্নায় আমার গলা বুজে এলো, ধরা গলায় ওকে বললুম :

"আমাকে ক্ষমা করো। সেদিন সন্ধ্যে বেলায় যখন তুমি বেরিয়ে গেলে, তখন আমি তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি; রাগ করেছি তোমার ওপর। সে সব কথা ভুলে যাও তুমি, লক্ষীটি ক্ষমা কর আমাকে।"

একটা মৃদু হাসি ফুটে উঠল ওর মুখে, যদিও হাসতে গিয়ে যন্ত্রণায় ওর মুখ কুঁচকে উঠল। তারপর বললে :

"না, না, এ আমারই দোষ। সবটাই আমার দোষ। আমি তোমার ওপর একটুও রাগ করিনি। আমি তোমাকে ভালবাসি কুয়েন, তোমাকে আমি খুব, খুব ভালবাসি।" পুলিশসুপারটা বাধা দিয়ে বলে উঠল :

"দাঁড়াও, দাঁড়াও। আগে বাড়ি ফেরো তারপর ওসব সোহাগের কথা বলবে। আর তোমাদের যাতে মিলন হয়, যাতে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে পার তার ব্যবস্থা করবার জন্যেই আমি এখানে এসেছি।"

তারপর ত্রোইর দিকে ফিরে বললে :

"জানালা দিয়ে লাফ দিতে গেলে কেন? আমি শুধু তোমাকে সরকারের নীতিটা বোঝাতে চেয়েছিলুম; একবার যদি তুমি সরকারী নীতিটা যে কত ভাল সেটা বুঝে ভিয়েৎকংদের কুসংসর্গ ছেড়ে দাও, তাহলে এক্ষুণিই তুমি তোমার সুখের সংসারে ফিরে যেতে পারবে। একথা ভাবতে কি তোমার মন খুশিতে ভরে ওঠেনা! আমি কিন্তু কথাটা শুরু করতে না করতেই তুমি…"

ত্রোই বাধা দিয়ে বলে উঠল :

"সরকারের লোক জড়ো করে বোঝাবার নীতিটা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে মিথ্যে মিথ্যে আপনার দম খরচ করবেন না।"

পুলিশসুপারটা তবুও নিজেকে সংযত করে রাখল; তারপর মধুমাখা সুরে বলে চলল :

"আমি জানি এ ব্যাপারে তুমিই আসল আসামী নও। এর পেছনে অন্য কেউ আছে।"

প্রবলভাবে মাথা নেড়ে ত্রোই বলে ওঠে :

"কেউই অপরাধী নয়। আগ্রাসক আমেরিকান দস্যুদের হত্যা করা কোন অপরাধ তো-নয়ই, বরং পবিত্র দেশসেবার কাজ, আর আমিই, শুধু আমি একাই মাকনামারাকে খতম করার সমস্ত পরিকল্পনা করেছিলুম, আর কেউ নয়।"

"ভাল করে একটু ভেবে দেখ। তুমি কি বুঝতে পারছ না যে তুমি একটা মারাত্মক রকমের অপরাধ করেছ? একজন প্রথম শ্রেণীর আমেরিকানকে তুমি খুন করার চেষ্টা করেছিলে।"

"লোকটা যে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের একজন মাতব্বর গোছের লোক সে কথা আমি জানতুম, আর জানতুম বলেই আমি ওর ওপর তাক করেছিলুম। এতে যে আমার নিজেরই প্রাণসংশয় হতে পারত সে জ্ঞানও আমার ছিল।"

ওকে ঘিরে যে পুলিশগুলো দাঁড়িয়েছিল তারা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল,

রাগে তাদের চোখগুলো আগুনের ভাঁটার মত জলছে। ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে তাদের হাত পা নিশপিস্ করছিল, কিন্তু পুলিশসুপার আগের মতই অচঞ্চল :

"তোমার, সুন্দরী কচি বৌটার কথা একবার ভাব। ওর ওপর দয়া কর। মাত্র কয়েক দিন আগেই তো ওকে তুমি বিয়ে করেছ, ওর সামনে এখনও দীর্ঘ জীবন পড়ে রয়েছে ; ওর জীবনটা অন্ততঃ এভাবে নষ্ট করে দিও না।"

"আমাকে গ্রেপ্তার করার পর থেকে প্রতিদিনই আপনি হাজারবার ধরে কেবল ঐ কথাটাই কানের কাছে জপ করে চলেছেন, 'ভেবে দেখ, এইতো সেদিন তোমাদের বিয়ে হয়েছে……,' আমার চোখের ওপর গুঁজে দিয়েছেন আমাদের বিয়ের ছবি, ভালবাসা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন,—এসব নিয়ে লম্বা লম্বা লেকচার ঝাড়ছেন আর স্বপ্ন দেখছেন—এর ফলে আমার অন্তরে সদা জাগ্রত দেশ-মাতৃকার মূর্তিকে আড়াল করে দাঁড়াবে আমার স্ত্রীর চিন্তা। কিন্তু বলি শুনুন—আপনারা মিথ্যে সময় নষ্ট করছেন। যতদিন ওই নোংরা ইয়াংকিরা এদেশের বুকের ওপর জোঁকের মত সেঁটে থাকবে ততদিন কারোর জীবনেই সুখের দেখা মিলবে না।"

ত্রোইর এই কঠোর তিরস্কারও পুলিশসুপার গায়ে মাখল না! সে বলল : "তোমার যাতে সময় কাটানর সুবিধা হয় তার জন্য গতকাল একটা টেপ-রেকর্ডার এনেছিলাম। সপ্তদশ অক্ষরেখা পার হয়ে সম্প্রতি একটা ছাত্র উত্তর থেকে দক্ষিণে পালিয়ে এসেছে তারই বলা কাহিনী ধরা ছিল ঐ রেকর্ডারে। কমিউনিস্টদের লৌহ যবনিকার ওপার থেকে পালিয়ে এসে তোমাকে তার অভিজ্ঞতার কাহিনী শোনাবে, এরকম লোকের দেখা সাক্ষাৎ তো আর যখন তখন পাওয়া যায় না। কিন্তু আমাদের সরকার যে তোমার ওপর কত সদয়, তোমার জন্যে যে কত ভেবে মরছে—তুমি এসব বুঝতেই চাইলে না। এমনকি রেকর্ডারটা পর্যন্ত ভেঙে ফেললে। তুমি সব সীমা ছাড়িয়ে গেছ। কোন মানবিক নীতিই তোমার উপর খাটবে না দেখছি।"

"সেই নোংরা জীবটা যদি তখন এখানে থাকতো, তা হলে আমি শুধু রেকর্ডারটা ভেঙেই ক্ষান্ত হতুম না, পাজীটার মাথাটাও গুঁড়িয়ে দিতুম। জানোয়ারটা শুধু কুৎসা করেনি, রাষ্ট্রপতি হো-চি-মিনেরও অপবাদ দিয়েছে। কতদূর ধৃষ্টতা!"

উত্তেজনায় ওর গলা চড়ে গিয়েছিল, কথা বলছিল প্রতিটা শব্দের ওপর জোর

দিয়ে দিয়ে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে হাঁপাতে লাগল ও। রাগে মুখ চোখ লাল হয়ে গেছে। দেখে মনে হচ্ছিল যেন ও আরও অনেক কিছু বলতে চাইছে।

কিন্তু এত সবের পরেও পুলিশসুপারটা অবিচলিত। সে শুধু বললে ঃ

"আমি আবার একদিন আসব' খন।" তারপর আমাকে বললে ঃ

"তুমিও আমার সঙ্গে ফিরে যাচ্ছ, সময় হয়ে গেছে।"

আমিও তাড়াতাড়ি আমার স্বামীর জন্যে একটি কমলা ছাড়িয়ে ফেললুম। খানিকটা ওকে খাইয়ে দিলুম, বাকিটা দিলুম ওর হাতে। তারপর ওর ওপর ঝুঁকে পড়ে ওর কানে ফিসফিস করে বললুম ঃ যেখানেই তুমি যাও না কেন আমি তোমাকে অনুসরণ করব। যখনই ওরা তোমাকে অন্য কোথাও সরিয়ে নিয়ে যাবে, তখনই বাড়িতে জানিও।"

ওরা তারপর আমাকে অন্য একটা জেলখানায় পাঠিয়ে দিলে। সেটা ছিল সাধারণ পুলিশদপ্তরের (General Police Department) অধীন। অন্য দশজন মেয়ের সঙ্গে আমাকে একটা সেলে আটকে রাখা হলো। তাদের মধ্যে দুজন আমার বয়সী ঃ একজন হলো অ (A)। একটা স্কুলের ছাত্রী। সে আমেরিকান বিরোধী প্রাচীরপত্র লাগাবার সময় ধরা পড়েছিল; অন্যজন হলো ঈ (Y)। সে একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কাজ করত। ঈ-এর ওপর বর্বরের মত নির্যাতন করা হয়েছিল; কারণ তার কাজের জায়গায় ওরা জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের ব্যানার আর দলিলপত্র পেয়েছিল। একদিন সকালে, সে দেওয়াল ধরে ধরে অতি কষ্টে জেরা করার ঘর থেকে ফিরে এল। জানোয়ারগুলো তার নখের নীচে পিন ফুটিয়ে দিয়েছে। তখনও ফোঁটা ফোঁটা করে রক্ত পড়ছে। সেলের মধ্যে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সে তার এক বান্ধবীর কাঁধে মাথা গুঁজে অঝোরে কাঁদতে শুরু করল।

"দোহাই, আমাকে একটু কাঁদতে দাও, একটু কাঁদতে দাও ঃ আমি কেবল এখানে, বন্ধুদের মধ্যেই কাঁদতে পারি। জানোয়ারগুলোর সামনে আমি কখনও কাঁদি না, ওদের যে আমি কতখানি ঘেন্না করি, সেটাই শুধু ওরা দেখতে পায়।"

এখানে আসার পর দুটো দিন কেটে গেছে তবু এখনও আমার কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়নি। অন্যান্য বন্দীরা আমার দিকে প্রীতিহীন ও সন্দেহমাখা চোখে তাকিয়ে থাকত। সেইদিনই সন্ধ্যাবেলা, খাওয়া-দাওয়া মিটে যাবার পরে সেলের মধ্যে একটা গানের সুর বেজে উঠল। মেয়েদের মধ্যে একজন একটা করে কলি গায়, তারপর অন্য সকলে একসঙ্গে চাপা গলায় সেটা গেয়ে ওঠে। ঈ' ও

ওদের সঙ্গে গাইতে লাগল। আমি ভেবেছিলুম—অত্যাচারে অত্যাচারে ওর সারা শরীর, সারা মুখ ক্ষত-বিক্ষত, এ অবস্থায় ও কি গান গাইবে! এখন ওর মুখ দিয়ে কেবল গোঙানিই বেরোতে পারে, গান নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু আমাদের দিকে মুখ করে সেলের দরজার লোহার গরাদে হেলান দিয়ে বসে ও গভীর আবেগের সঙ্গে গেয়ে চলল। ছেঁড়া নেকড়ায় জড়ান চোট লাগা হাতে তালি দিয়ে দিয়ে ও গানের তাল রাখতে লাগল। কেঁদে কেঁদে আমার চোখ তখনও রাঙা হয়ে আছে। তাই দেখে কিছুক্ষণ পরে ও আমাকে বললে: সবাই মিলে গলা মিলিয়ে গান গাইতে খুব ভাল লাগে। তোমাকে এত বিষণ্ণ লাগছে কেন? নাও, কান্না থামাও। থামিয়ে গলা মেলাও দেখি।" মেয়েরা পালা করে নজর রাখছিল। যখনই কোন প্রহরী এদিকে আসছিল, অমনি সকলে গান থামিয়ে এমন ভান করছিল যেন তারা গল্প-গাছা করছে, গানটা ছিল বেশ বড়; উত্তরের একজন সঙ্গীতকার সেটা রচনা করেছিলেন। সেটার নাম ছিল "আশার গান।"

আমার সব কান্না দূর হয়ে গেল।

এই আশা ভরপুর আবহাওয়ার মধ্যে আমার এই বিষাদময় মনোভাব একান্ত বেমানান বলে মনে হল। তারপর যখন দেখলুম 'ঈ' গানটাকে মুখস্থ করে ফেলবার চেষ্টা করছে তখন আমার আরও বেশি করে অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। জীবনের প্রতি ভালবাসায় ওর অন্তর উথলিয়ে উঠছিল। আমি একান্ত নির্ভরতা খুঁজে পেলুম ওর মধ্যে, আর ওর সব প্রশ্নেরই জবাব দিলুম এক এক করে। পরের দিন সকালে, আবার আমাদের কথাবার্তা শুরু হলো। আমার কি হয়েছে বললুম ওকে। যখন আমি আমার স্বামীর নাম উল্লেখ করলুম, তখন মনে হল ও ভয়ানক অবাক হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে ও জিগ্যেস করল, "কি বললে, হুয়েন ভ্যান ত্রোই? ম্যাকনামারাকে যে প্রায় যমালয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিল তুমি তারই বউ?"

"হ্যাঁ"

"আচ্ছা, এ কথা কি সত্যি যে ও জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে পা ভেঙেছে?"

"হ্যাঁ, হাসপাতালে ওকে আমি দেখে এসেছি।"

"হাঃ ভগবান!" ও চেঁচিয়ে উঠল। তারপর গভীর সহানুভূতির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল আর ওর ফুলে ওঠা হাত দিয়ে পরম স্নেহভরে আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললে: "ম্যাকনামারা গত বছরও পশ্চিমাঞ্চল পরিদর্শনের সময় এক চুলের জন্যে বেঁচে যায়। ও যে বিমানটায় ছিল তার পাহারাদার সঙ্গী বিমানটায় গোলা লাগে। এবারও দস্যুটা অল্পের জন্যে রক্ষা

পেয়ে গেল। তবে ত্রোই ওকে খতম করতে না পারলেও ইয়াংকি দস্যুটার হৃৎকম্প নিশ্চয়ই এখনও থামেনি। এইমাত্র একজনকে জেলখানায় ধরে এনেছে। সে আমাদের বললে—পুলিশ মাইনটা খুঁজে পেয়েছে; আর তারপরে বিস্ফোরকের খোঁজে কংলি* সেতুর চারপাশ তন্ন তন্ন করে তল্লাশী করেছে, কিন্তু সেতুটির ওপর দিয়ে যাতায়াত করার সাহস কোন ব্যাটার হয়নি। একটা হেলিকপটার ম্যাক-নামারাকে তান সন নাট বিমানঘাঁটি থেকে রিপাবলিকান হাসপাতালের মাঠে নিয়ে গেছে। সেখান থেকে একটা ঘুর পথ ধরে সে আমেরিকান রাষ্ট্রদূত ভবনে গেছে। ত্রোইর এই কাজের জন্যেই ওকে এই রকম ইঁদুরের মত লুকিয়ে লুকিয়ে ছুটোছুটি করে বেড়াতে হয়েছে।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই জেলখানার সমস্ত ব্লকে খবরটা ছড়িয়ে পড়ল—'ত্রোইর স্ত্রী চার নং সেলে রয়েছে।' আমাদের সেলের মুখোমুখি সেলগুলো থেকে একটা গলা ভেসে এল:

"ভগিনী ত্রোই ওখানে আছে, তাই না? হাল্কা নীল রঙের ব্লাউজ যার গায়ে, সেই কি 'ও'?

আমি উত্তর দিলুম: "হ্যাঁ, আমিই সেই।"

"তোমার সব খবর ভাল তো? ওরা কি তোমাকে মারধোর করেছে নাকি?"

তাঁর গলা শুনে তাঁকে একজন বয়স্কা মহিলা বলে মনে হলো। আমি উত্তর দিলুম:

"এখনও পর্যন্ত মারধোর করেনি, কেবল জেরা করেছে আর ভয় দেখিয়েছে।"

"জেলখানায় আমরা ত্রোই সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছি। যাদের যাদের জেল-খানায় পোরা হয়েছে তাদের মধ্যে যারা তাকে চেনে তারা, এমনকি পুলিশগুলোও বলছিল—'কী অসাধারণ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ত্রোইর। হাজার হাজার সিপাই পাহারায় ছিল; কিন্তু তা সত্ত্বেও ও ঠিক মাইন পেতে রেখে এল। দস্যুদলের চাঁইটাতো মাত্র একচুলের জন্যে বেঁচে গেছে……।' তোমার বয়স কত মা?"

*ন্যায় বিচার

"কুড়ি বছর।"

"তোমার কি কোন কিছু জিনিসপত্র চাই?"

আমি একটু ইতঃস্তত করছিলুম, কি বলব ঠিক বুঝতে পারছিলুম না। তার মধ্যেই আমার সঙ্গী অপর এক বন্দী বলে উঠল: "ও এখানে একেবারে খালি-হাতে এসেছে। সঙ্গে করে ওকে কিছুই আনতে দেয়নি।" দুপুরবেলা বন্দীরা

সব গিয়ে তাদের খাবার দাবার নিয়ে আসবে বলে সেলের দরজা খুলে দেওয়া হলো।

অনেকেই এই সুযোগে আমাকে কাপড়, চোপড়, একটা কম্বল, মশারী, দাঁত মাজার ব্রাশ, কিছু ফলমুল এবং আরও কয়েকটা টুকিটাকি জিনিস এনে দিল। এর মধ্যেই আবার আমাকে সঙ্গে করে খাবার ঘরে নিয়ে যাবার সুযোগটা কে পাবে তাই নিয়ে কয়েকটা মেয়ের মধ্যে এক পশলা তর্ক হয়ে গেল। সেখানে গিয়েও আবার তারা জেদ ধরলে যে আমাকে তাদের খাবারের ভাগ নিতে হবে। তাদের এই সহানুভূতিতে আমি প্রাণে নতুন বল ফিরে পেলুম; মনে হলো আমি যেন অনেক দিন পরে আবার আমার প্রিয় আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে এসে মিলিত হয়েছি। আমার পাশেই বসেছিল ভগিনী 'জ' (Z)। ও আমার কানে কানে বললে: "যদি তোমার কোন কিছুর প্রয়োজন পড়ে বা কোন অসুবিধা বোধ কর, একবারটি শুধু আমাদের ব'লো। আমরা তোমাকে সমস্ত বিপদে আপদে রক্ষা করব, সবপ্রকারে সাহায্য করব। আমাদের একমাত্র কামনা হলো—তুমি ভালো থাকো, আর মানসিক দিক থেকে উন্নতি হোক তোমার, যাতে ত্রোই মনে মনে শান্তিতে থাকতে পারে।"

ও বললে অল্প ক'দিন আগেই ত্রোইর সঙ্গে ওর দেখা হয়েছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে ওকে জিগ্যেস করলুম:

"কোথায় ওর সঙ্গে দেখা হলো তোমার? কি রকম দেখলে ওকে?"

পাতের ভাতগুলো গিলতে গিলতে ও ধীরে ধীরে বলতে লাগল: "জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে পা ভাঙার পরে ওকে ধরে ওরা খুব মারধোর করে। সন্ধ্যে পর্যন্ত ওকে সেখানেই ফেলে রাখে। তার পরে ওকে ওরা চো রায় হাসপাতালে কয়েদীদের ওয়ার্ডে নিয়ে গিয়ে ঢোকায়। আমরা মেয়ে বন্দীরা যারা তখন হাসপাতালে ছিলুম, দেখলুম কয়েকজন পুলিশ একটা লোককে বয়ে নিয়ে আসছে, লোকটির গলা পর্যন্ত কম্বলে ঢাকা। ওরা তাকে ঠিক আমাদের দরজার সামনেই শুইয়ে রাখল। লোকটির বয়স খুবই অল্প, কুড়ির থেকে খুব একটা বেশি হবে না। অনেক খোঁচাখুঁচির পর ওর পাহারাদারটার মুখ থেকে আমরা এইটুকুই মাত্র বের করতে পারলুম—'যে লোকটা ম্যাকনামারাকে খুন করতে চেষ্টা করেছিল, এই হল সেই লোক।' সঙ্গে সঙ্গে আমরা ছুটে গেলুম ওর সেবা শুশ্রূষা করার জন্যে। কিন্তু পুলিশগুলো আমাদের মারধোর করে ভাগিয়ে দিলে। শেষে অবশ্য ওরা ওর দেখাশোনা করার জন্যে আমাদের একজনকে ওর কাছে যেতে দিলে। আমাদের

মধ্যে থেকে একটি মেয়ে ওর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করল। কিন্তু ও তখন অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। ওর চোখ দু'টো বন্ধ। শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে সমান তালে বুকটা উঠছে-নামছে, যেন পরম নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে ও।

এখানকার প্রহরীটা খাওয়া দাওয়া সেরে চাবি নিয়ে আসবে, তার জন্যে ওর বদলি প্রহরীটা অপেক্ষা করছিল। তারপর তারা ওকে একটা সেলে বন্ধ করে রাখল। কিন্তু সেই রাত্তিরেই ৯টার সময় পুলিশগুলো আবার এল একটা ভ্যান সঙ্গে নিয়ে, আর ওকে অন্য আর এক জায়গায় সরিয়ে নিয়ে গেল। কারণটা জানবার জন্যে আমরা ফটকের একটা প্রহরীকে বার বার খোঁচাতে লাগলুম। মাথাটা ঝাঁকিয়ে লোকটা বললে: 'এই ভিয়েৎকংটা একটা সাংঘাতিক লোক। আজকেই দুপুর বেলায় লোকটা পালাবার চেষ্টায় জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়েছিল। পালাতে পারেনি, শুধু ঠ্যাংটাই ভেঙেছে। তখন ওকে ওরা এখানে নিয়ে আসে। লোকে মনে করবে যে এর পরে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যে ও চুপচাপ থাকবে। কিন্তু এই সন্ধ্যে বেলা যখন আমরা ওর সেলের জানলা দিয়ে ভেতরে তাকালুম, তখন কি দেখলুম জান? ও তার ব্যাণ্ডেজ-ট্যাণ্ডেজ সব খুলে ফেলে আর একবার পালাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে! ওকে এখন এমন এক জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে যেখানে ওর ওপর আরও কড়া নজর রাখা যায়। ও যদি কোন রকমে পালাতে পারত, তা হলে আমাদের সকলকে এতক্ষণে জেলে পোরা হত।

"দু'দিন পরে, ওকে যে পুলিশগুলো পাহারা দিত তাদের কয়েক জনের সঙ্গে আবার দেখা হয়ে গেল। ওরা আমাদের ওর সম্বন্ধে কয়েকটা ঘটনা বললে। যে দিন রাত্তির বেলা ওকে চো রায় থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল; সেইদিনই দস্যুগুলো ওর নতুন জেলখানায় গিয়ে হাজির হলো সব ঠিকঠাক আছে কি না দেখতে। একই দিনে ওর দু'দু'বার পালাবার চেষ্টার কথা শুনে ওরা সবাই খুব ঘাবড়ে গিয়েছিল। একটা পা ভাঙা, হাতে হাতকড়া পরান, মারের চোটে সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত আর কালশিটে দাগে ভরা—তবুও ত্রোই সগর্বে উঁচু করে রেখেছিল ওর মাথা। শয়তানদের প্রত্যেকটা অপমানকর কথা ও সুতীব্র প্রত্যুত্তরে ফিরিয়ে দিচ্ছিল; ওর ধারাল জিব চাবুকের মত আঘাত হানছিল ওদের ওপর। দস্যুগুলো ওকে কমিউনিস্টদের একজন চর বলে অভিযুক্ত করল; কমিউনিজমকে সমস্ত রকমের অপবাদে কলুষিত করার চেষ্টা করার পরে ওরা ওকে কমিউনিস্টদের দ্বারা প্ররোচিত একজন অন্তর্ঘাতক এবং সন্ত্রাসবাদী বলে অভিযুক্ত করল।

এর জবাবে ত্রোই বলল : 'কমিউনিস্টরা কখনও কারও কোন ক্ষতি করেছে বলে তো আমি কোনদিন শুনিনি; অন্যদিকে শিশুকাল থেকেই দেখে আসছি ইয়াংকী খুনেরা বন্যার স্রোতের মত এসে ঢুকছে আমাদের দেশে, আর দিনের পর দিন তাদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। দেখে আসছি ওদের বিমানের হিংস্র গর্জনে সায়গনের আকাশ বাতাস চৌচির হয়ে যাচ্ছে, আর বোমা ফলে, গোলাগুলি হেনে কসাইয়ের মত নির্বিকার চিত্তে আমাদের দেশের মানুষকে খুন করে চলেছে পাইকারী হারে'।

"তারপর প্রচণ্ড ঘৃণার সঙ্গে বললে : 'তোমরা, ইতরেরা যদি আমাকে কমিউ-নিস্টদের চর বলতেই থাকে, তা হলে আমি একে আমার প্রতি সম্মান বলেই মনে করব। কমিউনিস্টরা জনগণের কল্যানের জন্যেই প্রাণপাত ক'রে চলেছে। আমেরিকানদের পা-চাটা কুকুরদের কেবল নিজেদের পরিচয় দিতে লজ্জা পাবার কথা, কমিউনিস্টদের নয়।"

সেদিন রাতে বদমাসগুলো পুলিশকে ওর ওপর আরও কড়া নজর রাখার জন্যে হুকুম দিলে, যাতে ও কিছুতেই আবার পালবার চেষ্টা করতে না পারে।

পুলিশগুলো দিনরাত ত্রোইর পাশে পাশে থাকত, আর শুনতো ওর কথা। ত্রোই ওদের কাছে রাজনৈতিক অবস্থার কথা বলত আর তা ব্যাখ্যা করে শোনাত। ওদের মধ্যে বিশেষ করে একজন ত্রোইকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখত। সে আমাদের বললে যে তার সঙ্গে কথা বলার সময় ত্রোই খুব নরম স্বরে কথা বলত; শয়তানগুলোর কথার মুখের মত জবাব দেবার সময় তাদের সঙ্গে যখন তর্কা-তর্কি করত সেই সময় ও যেমন কঠিন স্বরে কথা বলত, তেমন ভাবে নয়। পুলিশটা আরও বললে যে সে ত্রোইকে খাবার জন্যে জল এনে দিয়েছিল আর এনে দিয়েছিল গা মোছবার জন্যে একটা ভিজে তোয়ালে।"

মেয়ে বন্দীরা সেদিন জেলখানার আঙিনায় গিয়ে রোদে বসার অনুমতি পেয়ে-ছিল। আমাদের মত অল্প বয়সীদের কাছে রোদে গিয়ে বসা বা শাস্তিমূলক খাটুনির কাজে যাওয়া ছিল বেশ এক মস্ত সুযোগ। সেই সময়ে আমরা ভগিনী 'জ' বা অন্যান্য বন্দীদের কাছে শত্রুদের জেলখানায় যে সব সংগ্রাম চলছিল সে সব সম্বন্ধে নানা কাহিনী শুনতাম। ভগিনী 'জ' অনেক জেলখানায়ই ঘুরেছে। মাটির নিচে অন্ধকার পাতাল ঘরে বছরের পর বছর নির্জন কারাবাসে কাটিয়েছে সে। ওর স্বামীর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়েছিল, আর সম্ভবতঃ সে দণ্ড কার্যকরী করাও হয়ে গিয়েছিল। তবুও আমাদের বন্দীদের মধ্যে ও-ই ছিল সকল আনন্দ আর আশার

উৎস। প্রায়ই সে বসে বসে আমাদের 'ভ্রাতা ডং' কবিতাটা মৃদুকণ্ঠে আবৃত্তি করে শোনাত আমাদের জেলখানায় ওটা 'কমিউনিস্টদের তেজস্বিতা প্রসঙ্গে কবিতা' বলেও পরিচিত ছিল। ও আমাদের কাছে ভ্রাতা ডং-এর বৈপ্লবিক কাজকর্মের গল্প করত আর শোনাও গিয়াছিল জেলখানায় তাঁর বীরের মত মৃত্যু বরণের কাহিনী। ও ডং-এর বৌ-এরও খুব প্রশংসা করত। অনেকগুলো সন্তানকে লালন-পালন করতে হতো তাকে তবুও তিনি অবিচলিত চিত্তে তাঁর স্বামীর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, আর জেলখানায় জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বিপ্লবের সমর্থনে সংগ্রাম করে গিয়েছিলেন।

আমার বিশেষ করে সেই সব মেয়েদের কাহিনী শুনতে ভাল লাগত যারা বিশ্বস্ততার সঙ্গে তাদের স্বামীদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সুখ-দুঃখের ভাগ নিত। কিন্তু সেই সঙ্গে, এই কাহিনীগুলো শুনতে শুনতে আমার নিজের কথা ভেবে লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে যেত। আমি যে আমার স্বামীর বিপ্লবী কার্যকলাপে বিন্দুমাত্রও সাহায্য করিনি শুধু তাই নয়, আমি প্রায়ই চেঁচামেচি করে একটা ন্যক্কারজনক অবস্থার সৃষ্টি করতুম। হতভাগ্য ত্রোই! যে দিনই তার বাড়ী ফিরতে দেরী হয়ে যেত সেইদিনই সে খেয়াল করে আগে আমার বাপের বাড়ী গিয়ে হাজির হত। সেখান থেকে আমার ছোট বোনটাকে সঙ্গে করে নিয়ে তবে বাড়ী আসত, যাতে আমি তাকে চপলমতি বলে সন্দেহ না করি। এই রকম হাজারো ঘটনা আমার মানসচক্ষুর সামনে এসে ভীড় করতে লাগল আর আমার অন্তরকে অসংখ্য সূচের মত বিঁধতে লাগল। আমি বিস্ময় আর বেদনার সঙ্গে ভাবতে লাগলুম, আমাদের বিয়ের আগে ও তারপরে কিভাবেই না ত্রোইকে তার এই দুরূহ ও বিপজ্জনক কর্মভারের ওপর তার সমস্ত শক্তি ও চেতনাকে কেন্দ্রীভূত করতে হয়েছিল, আবার সেই সঙ্গে আমার মনের শান্তি যাতে নষ্ট না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হয়েছিল।

আমার দু'চোখ জলে ভরে উঠছে দেখে ভগিনী 'জ' বললেন: নিজেকে সংযত করবার চেষ্টা কর। তুমি যদি কান্নাকাটি কর, তাহলে ওদের মনে সন্দেহ হবে আর আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে ভেতরে ঢোকাবে।'

আমি তাকে বললুম, "অন্যান্য লোকে তাদের বিপ্লবী কাজকর্মে তাদের স্বামী বা স্ত্রীদের কাছ থেকে সাহায্য পায়। কিন্তু আমার বেলা? আমি যে ত্রোইকে বিন্দুমাত্র সাহায্য করিনি শুধু তাই-ই নয়, উপরন্তু প্রায়ই আমি তার পথের বাধা হয়ে

দাঁড়িয়েছিলুম, আমি যে ওর বিশ্বাস অর্জন করতে পারিনি একথা ভেবে আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে।"

'বিপ্লবী কাজকর্মে প্রত্যেককে তার ওপর দেওয়া কাজের ভার সমাধা করতেই হবে,'—ভগিনী 'জ' বুঝিয়ে বললে। 'যদি কাজটার জন্যে একান্তভাবে প্রয়োজন না হয়, তাহলে তার অন্য কারো কাছে এ সম্বন্ধে কোনও কথা বলা একেবারেই বারণ। এটা একটা অলঙ্ঘনীয় নিয়ম। প্রত্যেককেই এটা মেনে চলতে হয়। তোমার ওপর বিশ্বাস না থাকলে, ত্রোই তোমাকে ভালবাসল কি করে? এখন বল দেখি, এসব নিয়ে কি তোমাদের মধ্যে প্রায়ই আলোচনা হত?'

'ও প্রায়ই আমার খুঁত ধরত।'

'কি ব্যাপারে বলতো?'

আমি এ বিষয়ে একটু ভেবে নিয়ে বললুম:

"পড়শীদের সঙ্গে আচার-আচরণে আমি যদি কোন অবিবেচনার পরিচয় দিতুম তাহলে ও তার সমালোচনা করত। জমকালো সাজপোষাক পরা ও আদৌ পছন্দ করত না। বলত, 'আমরা মুটে মজুর মানুষ, সাজপোষাকের লোক দেখান জমকাল ঢংঢাং নকল করা আমাদের সাজে না।' আমি হয় সমুদ্রের মত নীল রঙের, আর নয় সাদা রঙের জামাকাপড় পরি। ও ঐ রঙ দু'টোই পছন্দ করত। ও সিনেমা যেতে চাইতো না, বলত: 'সায়গন যখন হ্যানয়েরই মত সুখ আর সমৃদ্ধিতে ভরে উঠবে তখন আমরা প্রাণ ভরে সিনেমা দেখব।'

"আমাদের দু'জনের ভাব-আলাপ হবার পর থেকে এতদিনে দু'বছর কেটে গেছে, কিন্তু, এই দু'বছরের মধ্যে একবারই মাত্র আমরা সিনেমায় গিয়েছিলুম।"

ভগিনী 'জ' জিগ্যেস করলে:

'এখন তো বুঝতে পারছ, ইয়াংকিদের ও কী তীব্রভাবে ঘৃণা করত। তোমার কাছে কি সে কখনও তার এই মনোভাবের কথা বলেছিল?'

"ওঃ হ্যাঁ, প্রায়ই বলত। ও আমাকে বলেছিল, '১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্র—দিয়েম কু চক্র প্রথম যে "কমিউনিস্টদের নিন্দা কর" অভিযান শুরু করেছিল আমাদের নিজেদের অঞ্চলই তার কবলে পড়েছিল। চো তুয়ক আর ভিন ত্রিন-এ আমি মানুষকে সারবন্দীভাবে তার দিকে একসঙ্গে হাত বাঁধা অবস্থায় গোরু-ছাগলের মত তাড়িয়ে নিয়ে যেতে দেখেছি; তাদের যে কোথায় চালান করেছিল কেউই জানতে পারেনি। তাদের মধ্যে থেকে কেউই আর ফিরে আসেনি। ওর দিদি একবার ওকে বলেছিল: 'খুব বাঁচোয়া যে তুই এখনও ছোট্টটি আছিস,

না হলে তোর কপালেও ঐ একই দুর্দশা ঘটতো।' আমাদের দু'জনের ভাব হবার কিছুদিন পরেই ও একবার কোয়াং নাম-এর ওদের দেশের বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছিল। তারপর সেখান থেকে হুয়ে পর্যন্ত গিয়েছিল, ও যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছল ঠিক তখনই প্রথমবার বৌদ্ধদের নির্যাতন করে দাবিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সায়গনে ফেরার পর যখন দু'জনের আবার দেখা হলো, তখন ও রাগে ফুঁসছে। ও আমাকে বললে, 'আমি নিজের চোখে মানুষকে ট্যাঙ্কের ক্যাটারপিলার বেল্টের নীচে পিষে যেতে দেখেছি, দেখেছি কামানের গোলার আঘাতে মানুষের দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে।' ও আরও বললে, 'ইয়াংকিরা ফরাসীদের চেয়েও বেশী বর্বর, অনেক অনেক বেশী অমানুষ।' পরে যখনই এইসব ঘটনা ওর মনে পড়ত, তখনই ও চেঁচিয়ে উঠত, 'কামান দেগে জনসাধারণের বিক্ষোভ দমন করা! সারা দুনিয়ার মধ্যে দক্ষিণ ভিয়েতনামই বোধহয় একমাত্র জায়গা, যেখানে এইরকম বর্বরতা ঘটতে পারে।' অনেকদিন ধরেই আমি জানতুম যে ও আমেরিকান আগ্রাসকদের ঘৃণা করে। এমন কি ও কখনও তাদের আমেরিকানও বলত না। রাস্তায় বেড়াবার সময় যদি কখনও আমরা আমেরিকান সৈন্যদের গাড়ীর সারের সামনে পড়ে যেতুম তাহলে ও আমাকে থামিয়ে বলে উঠত, 'দাঁড়াও, আগে ঐ নোংরা শুয়োরগুলো চলে যাক। আমেরিকান আগ্রাসকদের ও ঐ নামেই ডাকত।' কিন্তু এই অল্প কয়েকদিন আগে ছাড়া আর কখনও আমি ওর আমেরিকান-বিরোধী কার্যকলাপের কথা কিছুই জানতে পারিনি। অবশ্য ও যে সব গল্প-টল্প আমায় শোনাত তার থেকে আর ওর আচার-আচরণ থেকে সন্দেহ হয়েছিল যে ও কোন আমেরিকান-বিরোধী সংগঠনে যোগ দিয়েছে। আমাদের বিয়ের অল্প কয়েকদিন পরেই, একদিন ও বাড়ী এল খুশীতে ডগমগ হয়ে। এসেই আমাকে জিগ্যেস করলে, 'আজকে একটা অসাধারণ খবর আছে! তুমি শুনেছ সেটা?' আমি তো একেবারে অবাক, কিছুই জানতুম না আমি। তাই দেখে ও আবার বললে, 'আমাদের লোকেরা একটা ১৫,০০০ টনী বিমানবাহী জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছে। তাতে অনেকগুলো উড়োজাহাজ ছিল, সবশুদ্ধ ডুবেছে। কত বড় একটা দুঃসাহসিক কাজ! আমি যদি এরকম কিছু একটা করতে পারতুম।' তার কয়েকদিন পরে, একদিন ও দুপুরে খেতে বাড়ী এল না। সেদিন ছিল ৬ই মে, অন্যান্য শ্রমিকদের সঙ্গে ও সেদিন একজন ট্যাক্সি চালকের সৎকার মিছিলে যোগ দিতে গিয়েছিল; ইয়াংকিরা চালকটিকে গুলি করে খুন করেছিল। শেষে যখন ও বাড়ী ফিরে এল তখন ও বললে, 'জানো? সৎকার মিছিলটা একটা প্রকাশ্য আমেরিকান-বিরোধী

বিক্ষোভ মিছিলে পরিণত হয়েছিল; তাতে আওয়াজ তোলা হয়েছিল: আমেরিকান আগ্রাসক আর খুনেরা নিপাত যাক্। এরপর ১৫ই মে থেকে ২২শে মে পর্যন্ত একটা আমেরিকান-বিরোধী সপ্তাহ পালন করা হবে, সেই সময়ে ট্যাক্সি-চালকেরা আমেরিকানদের ভাড়া নিয়ে যেতে অস্বীকার করবে। অন্যান্য ব্যবসাপাতির- লোকেরাও আমেরিকানদের বর্জন করবে, এমনকি খবর কাগজের কেরিওয়ালারা আর জুতো পালিশ ওয়ালারাও ওদের বর্জন করবে।' ও সেই আমেরিকান-বিরোধী সংগ্রাম সপ্তাহের জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল, কিন্তু ৯ই মে-ই ও গ্রেপ্তার হলো। ভগিনী 'জ' মাথা নেড়ে বলে উঠল, 'ভাই কুয়েন, তোমার মনটা সত্যি সত্যিই ভারি সাদাসিধে। তুমি বুঝতে পারনি যে ত্রোই তোমাকে বিশ্বাস করতো, আর তোমাকে মনের দিক থেকে বিপ্লবী কাজ-কর্মের জন্যে প্রস্তুত করে নিচ্ছিল। সায়গনের মত একটা শত্রু অধিকৃত শহরে জনসাধারণের সক্রিয় ভালবাসা এবং আশ্রয় ছাড়া যে কেউ-ই সে'দিনে শত্রুর গুপ্তচরদের খপ্পরে পড়ে যাবে। ত্রোই-এর সমালোচনার একমাত্র লক্ষ্য ছিল তুমি যাতে ন্যায়নিষ্ঠ মেয়ে হিসেবে গড়ে উঠতে পার—এমন মেয়ে যে অন্যায় থেকে ন্যায়কে সহজেই চিনে নিতে পারবে—যা কিছু সে তোমাকে বলতো তার মূল লক্ষ্য ছিল দক্ষিণের এত শোষণ, এত নির্যাতন চালাচ্ছে যারা তাদের সম্বন্ধে তোমাকে ধীরে ধীরে সচেতন করে তোলা, আর তোমার মনে তাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঘৃণা জাগিয়ে তোলা, যাতে তোমার মনেও বিপ্লবে যোগ দেবার আকাঙ্খা জেগে ওঠে। তোমার কথা শুনে তোমার স্বামীর প্রতি আমার শ্রদ্ধা ক্রমশঃই বেড়ে যাচ্ছে। একটা অল্পবয়সী তরুণ, সবে হয়তো কুড়ি পার হয়েছে, সায়গনের মত এরকম একটা পাপ-পঙ্কিল শহরে সে বাস করে—যে-শহরে সকল রকমের কুৎসিত প্রলোভনের ছড়াছড়ি। তবুও, সে কিনা দু'বছরের মধ্যে একবার মাত্র সিনেমা দেখতে গিয়েছিল—আর তাও বোধ হয় নিজের ইচ্ছেয় নয়, শুধুমাত্র তার ভালবাসার পাত্রীকে খুশী করার জন্যে। ভাবতে পারো একথা!'

আমার অস্বস্তি বোধ হতে লাগল, কারণ ও ঠিক জায়গাটাতেই ঘা দিয়েছে। আমি বললুম, "আমরা যে ছবিটা দেখেছিলুম সেটা ছিল বুদ্ধের জীবনী সম্বন্ধে। আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। পরে ও কাজের থেকে ফিরলে আমি ওকে ছবিটা সম্বন্ধে জিগ্যেস করলুম। কিন্তু ও বললে যে ছবিটার কথা ওর কিছুই মনে নেই।" অন্যান্য বন্দিনীরা হাসিতে ফেটে পড়ল। হাসি চাপবার জন্যে কেউ কেউ মুখে হাত চাপা দিলে। ভগিনী 'জ' আমাকে জিগ্যেস করলে:

'তার নিজের জীবন সম্বন্ধে ও কখনও তোমাকে কিছু বলেছিল ?'

আঙিনার দূর প্রান্তে একটা রোদে ভরা জায়গায় আমরা সরে গিয়ে বসলুম। আমার সঙ্গিনীরা সবাই একাগ্রচিত্তে আমার কাহিনী শুনছিল। তাই দেখে আমি আবার বলতে শুরু করলুম :

"যে অঞ্চলে ওদের আদি বাড়ী ছিল, সেখানে আমি কখনও যাই নি। ও কথা দিয়েছিল যে একবার আমরা সেখানে যাব। ও বলেছিল, 'আমাদের বিয়েটা মিটে যাক, তারপর দিন কয়েকের জন্যে ছুটি নিয়ে আমরা দেশের থেকে বেড়িয়ে আসব।' ও বলেছিল, কোয়াংনাম একটা দারিদ্র প্রপীড়িত অঞ্চল, মাত্রসামান্য দু'একটা ধান চাষের উপযোগী মাঠ আছে। তাই কাজের খোঁজে সেখানকার অধিবাসীদের চারদিকে ঘুরে বেড়াতে হয়। অফুরন্ত যা আছে তা হলো শুধু জল। এখানে এই সায়গণের মত নয়—যেখানে এক বালতি জলের জন্যে মানুষকে সরকারী কলের সামনে কামড়াকামড়ি করতে হয়। ও আমাকে বলেছিল, কত সুন্দর সেই থুবন নদী। তার বাড়ী থেকে নদীটা মাত্র ১০০ মিটারের মত দূরে। তার কাকচক্ষু স্বচ্ছ জল তির্‌তির্‌ করে বয়ে চলেছে। তার বালুময় দুই তীর বাঁশ ঝাড়ে ঝাড়ে ছায়াময় হয়ে আছে। ছুটির দিনে আমরা যখন সায়গনের অধিবাসীদের ভুং তাউ-এর সমুদ্র উপকূলবর্তী ভ্রমণকেন্দ্রগুলোতে গিয়ে ভীড় করতে দেখলুম, তখন ও আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বলত : 'যখন আমরা আমার দেশের বাড়ীতে বেড়াতে যাব, তখন দেখবে নদীতীরের বিস্তীর্ণ বালুময় প্রান্তরগুলো সমুদ্র উপকূলের বেলাভূমির মতই সুন্দর। রৌদ্র সেবন করার অফুরন্ত সময় পাব আমরা।' ওর ছেলেবেলা কেটেছে খুব দুঃখ কষ্টের মধ্যে। ও যখন খুবই ছোট তখনই ওর মা মারা গিয়েছিলেন। ওর বয়েস যখন মাত্র তিন বছর তখন ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী দস্যুরা পশু শিকারের মত বিপ্লবীদের খুঁজে বের করে খুন করার জন্যে ওদের ঐ অঞ্চলে হানা দেয়। ওর মা ওকে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে লুকোয়, কিন্তু ক্ষিধের জ্বালায় আর ঠাণ্ডা ও বৃষ্টি-বাদলের মধ্যে থাকতে থাকতে তিনি দু'এক মাসের মধ্যেই মারা যান। ওর বাবা ফরাসীদের হাতে বন্দী হয়েছিলেন জেল থেকে বেরিয়ে তিনি অনেক দূরে এক জায়গায় কাজ করতে চলে গেলেন ; কয়েক বছর অন্তর অন্তর এক-আধবার মাত্র তিনি বাড়ী আসতেন।

ত্রোইর এক কাকা, তার বড় দাদা আর তার ভগিনীপতি তাকে লালন-

পালন করেন। 'আমাদের বিয়ে হবার আগে একদিন আমদের ঝগড়া হয়েছিল ; এতে ও মনে খুব দুঃখ পেয়েছিল। ও আমাকে বলেছিল, 'খুব ছোট্ট বেলাতেই আমি মাকে হারিয়েছিলুম, বাবারও দেখা পেতুম বছরের মধ্যে এক-আধবার, তাও মাত্র দু'চার দিনের জন্যে। একটা পারিবারিক জীবনের স্বাদ পাবার জন্যে আমার প্রাণ তাই ব্যাকুল। এখন আমি একজন মনের মানুষ পেয়েছি, কিন্তু সেও আমার ওপর রাগ করে আমার মনে কষ্ট দিচ্ছে। উত্তর থেকে তোমার পরিবার-পরিজন উঠে এসে এখানে বসবাস শুরু করেছে, আমাকেও আমার জন্মস্থান কোয়াংনাম ছেড়ে এখানে চলে আসতে হয়েছে এক মুঠো অন্নের সংস্থান করতে। দু'জনেই আমরা একই দুর্দশার শিকার। এখন, একবার যখন আমাদের আলাপ হয়েছে, আমরা দু'জনে দু'জনের কাছাকাছি এসেছি, তখন আমাদের উচিত পরস্পরকে ভালবাসা, পরস্পরের প্রতি স্নেহশীল হওয়া।'

'ওর বয়স যখন ১৫ বছর, তখন ত্রোই দা-নাং-এ তার বড় দাদার কাছে থাকার জন্যে চলে এল। মনে আশা সে এখানে নিজেরটা নিজে চালিয়ে নেবার মত কোন একটা পথ খুঁজে পাবে। কিন্তু সে পথের হদিশ পাওয়া তো অত সহজ নয়। ইতিমধ্যে ও বুঝতে পারল যে তার দাদা বা ভগিনীপতি কারোর ওপরই ওর আর ভার বোঝা হয়ে থাকা সম্ভব নয় ; কারণ তারা নিজেরাই এত গরীব যে তাদের নিজেদের সংসারই চলা দায়। তখনই ও মনস্থির করল যে ও সায়গনে চলে যাবে। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। হাজির হলো গিয়ে জাহাজ ঘাটায়, আর তারপর একটা সায়গণগামী জাহাজে চড়ে বসল। আসার আগে ও তার দাদা আর পরিজনদের উদ্দেশ্যে একটা চিটি লিখে তার এক বন্ধুর হাত দিয়েছিল। কিন্তু ওর বন্ধুটি জাহাজ ছেড়ে যাবার আগেই চিঠিটা তার দাদার হাতে পৌছে দিয়েছিল। তার ফল হলো এই—ত্রোই তখন জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে, হঠাৎ দেখলে যে তার দাদা ঝড়ের বেগে সাইকেল চালিয়ে জাহাজ ঘাটায় এসে হাজির হলো। ত্রোই তাড়াতাড়ি নিচে নেমে জাহাজের খোলের মধ্যে গিয়ে লুকোল। তার দাদা জাহাজঘাটার এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত ত্রোইকে ডেকে ডেকে ফিরতে লাগল : 'ত্রোই, বাড়ী ফিরে আয়, ভাই। আমরা একরকম করে ঠিক চালিয়ে নেব। জামাইবাবু আর আমি দু'জনে মিলে তোর দেখাশোনা করব। আমাদের ছেড়ে চলে যাসনে ভাই।' আর এদিকে লুকিয়ে বসে বসে ত্রোই আকুল হয়ে কেঁদে ভাসাতে লাগল। ও তার দাদাকে গভীর ভাবে ভালবাসত, কিন্তু বউ আর অনেক ক'টি ছেলেমেয়ে নিয়ে যে নিজেই বহু কষ্টে সংসার চালাচ্ছে, তার ওপর

অতিরিক্ত ভার বোঝা হয়ে থাকা ও কিছুতেই সইতে পারবে না। যতক্ষণ না জাহাজটা জাহাজঘাট ছেড়ে দূরে চলে গেল, ততক্ষন ঘাট থেকে ত্রোইর দাদার ডাক ভেসে আসতে লাগল :

ত্রোই! আমাদের সঙ্গে বাড়ী ফিরে চল, ভাই। দু'বেলা যা জোটে তাই আমরা সকলে মিলে ভাগ করে খাব। ফিরে আয়, ভাই···।' সে আমাকে প্রায়ই শোনাত তার দাদার এই বুকভাঙা কাতর ডাকের কথা, যা ওর নিজের অন্তরকেই কাঁদিয়ে তুলেছিল ব্যাকুলভাবে।

"কিন্তু কোন একটা কাজকর্মের খোঁজ পেতে, সেটা শিখতেও তো সময় লাগে। তার ওপর পেটটাও তো ততদিন চুপ করে থাকবে না। এদিকে ও তার বাবাকেও খুঁজে বের করতে পারল না। ফলে পেটের দায়ে ও একটা ছ্যাকড়া গাড়ী চালাতে শুরু করল। কিন্তু শহরের রাস্তাঘাট তখনও ওর ঠিকমত চেনা-জানা হয়নি। ফলে পথ ঠিক করতে না পেরে সে প্রায়ই তার চড়নদারদের অনেকটা ঘুরপথে নিয়ে যেত; এতে তারা রাগে গজগজ করতে শুরু করত, আর তার পাওনা ভাড়া থেকে পয়সা কেটে নিত। কখন কখন এমনও হত যে, কোন কারণে চড়নদারের মেজাজ খারাপ হয়ে আছে, তারপর সে ত্রোইকে এই ভাবে রাস্তা জিগ্যেস করে যেতে দেখে, রেগে ওকে গালিগালাজ করে ওর ছেড়ে গাড়ি অন্য একটা ছ্যাকরার গাড়ী ডেকে নিয়ে তাতে চড়ে চলে যেত, ওকে একটা পয়সাও দিত না। প্রায়ই তাকে অনাহারে কাটাতে হত তার জীবনের এই সময়টা কেটেছে প্রচণ্ড দুঃখ কষ্টের মধ্যে। ও বলতো, কেউ কেউ ভাবতে পারে যে বুড়ো লোকের বেশী খাটা-খাটনির কাজ করতে পারে না। তাই তাদের রুজি-রোজারেরও কোন উপায় নেই। কিন্তু আমার বয়স তখন কম, আর শরীরটাও ছিল শক্ত সমর্থ। আর আমি সূর্যাস্ত পর্যন্ত পরিশ্রম করতুম। তবুও আমি কখনও পেটপুরে খেতুম না। কিন্তু আমার চারপাশে তাকিয়ে দেখতুম যে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা টাকা পয়সা নিয়ে কি করবে তাই ভেবে ঠিক করতে পারত না। ছ্যাকড়া-গাড়ীর মালিকের কথাই ধর: যেটুকু মাত্র কাজ সে আর তার পরিবারের লোকজন করত, তা হলো যে-গরীব হতভাগ্যরা ওদের কাছ থেকে গাড়ীগুলো ভাড়া নিত, তাদের কাছ থেকে ভাড়ার টাকা আদায় করা। কিন্তু অফুরন্ত তাদের খাবারের ভাণ্ডার; অগুণতি তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ। আর তারা মনে করত যে এই ছ্যাকড়াগাড়ীর চালকদের ওপর হম্বিতম্বি করার গালিগালাজ করার অধিকার তাদের জন্মগত।

"এর কিছুকাল পরে, ওর এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় ওকে এক বিদ্যুৎ-কারিগরের শিক্ষানবীশের কাজ জোগাড় করে দিয়েছিল। একটা একটা করে দু'টো প্রতিষ্ঠানে ও কাজ করল, কিন্তু কোনখানেই আধপেটা খাওয়ার বেশী মজুরী পেত না। তারপর ও চলে এল ন্-গোক আন (Ngoc Anh) কারখানায়। গ্রেপ্তার হবার আগে পর্যন্ত ও সেখানেই কাজ করেছে।"

ইতিমধ্যে রোদ পোহানোর সময় ফুরিয়ে গেছে, জেলখানার প্রহরীরা আমাদের সেলে ফিরে যাবার জন্য চেঁচামেচি করে তাড়া লাগাতে লাগল। এরপরে, যখনই একটু-আধটু সুযোগ পাওয়া যেত, আমার সঙ্গী বন্দিনীরা ত্রোইর সম্বন্ধে আরও গল্প শোনাবার জন্যে আমাকে ধরত। ওর সম্বন্ধে গল্প করতে আমার কেমন একটু লজ্জা লজ্জা করত।

তাই দেখে ভগিনী 'জ' একদিন আমাকে বললে :

'আমাদের যাদের জেলখানায় এনে ভরা হয়েছে, যাদের অবিরাম নির্যাতন আর দুর্ব্যবহার সহ্য করতে হবে, তারা বিশেষ বিশেষ মহান কমরেডদের জীবনী এবং সংগ্রামের আদর্শ থেকে সাহস সঞ্চয় করি। এই থেকে নতুন শক্তি পাই—সকল পরীক্ষার সম্মুখীন হবার, আর শত্রুর প্রতি তীব্র ঘৃণায় অন্তর কানায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। আমি ত্রোইর সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনতে চাই, আর অনুসরণ করতে চাই তার বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপের। ভ্রাতা ডং সম্বন্ধে একটা কবিতা লেখা হয়েছে। জেলখানাগুলোর জন্যে ভ্রাতা ত্রোইকে নিয়েও একটা গান রচনা করা উচিত, আর নিশ্চয়ই তা করতে হবে।'

"একদিন আমাকে কয়েকজন পুলিশের লোকের সঙ্গে দেখা করার জন্যে ডাকা হলো। তারা আমায় জিগ্যেস করল : 'তোমার স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে চাও?' আমি ছুটিতে উত্তর দিলাম, "এক্ষুণি।"

ওরা বললে : 'কিন্তু একটা শর্ত আছে : অপরাধ স্বীকার করবার জন্যে ওকে তোমায় চাপ দিতে হবে।'

"আমি চুপ করে রইলুম। স্বামীদের উপর প্রভাব বিস্তার করার জন্যে 'নরম ধরণের' বৌদের কাজে লাগাবার পুলিশী কায়দার কথা ভাগিনী 'জ' আমাকে বহুবার বলেছে। ওরা এবার সেই কায়দাটা আমার ওপর খাটাবার চেষ্টা করছে। ওরা আমাকে এত তাড়াতাড়ি বের করে নিয়ে চলল যে, ত্রোইর জন্যে যে কিছু খাবার-দাবার কিনে নিয়ে যাব তার জন্যে একটুকুও সময় পেলুম না। মনে মনে আমি আশা করছিলাম যে, কিছুদিন বিশ্রাম পাওয়ার ফলে ত্রোই নিশ্চয়ই তার

কিছুটা শক্তি ফিরে পেয়েছে, কিন্তু ওর কাছে পৌছাবার পর দেখলুম ওর সঙ্গে প্রথমবার দেখা করার সময় যেমন ছিল, এখনও ঠিক সেই একই রকম অবস্থাতেই রয়েছে—ওর চোখ মুখ বসে গেছে, রক্তশূন্য ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে ওকে। চুলগুলো এতো বড় বড় হয়েছে যে তাতে ওর কান পর্যন্ত ঢাকা পড়ে যাচ্ছে; থুতনিতে খোঁত খোঁত একটুখানি দাড়ি গজিয়েছে, আর কি বিশ্রী রকমেরই না নোংরায় ভরে রয়েছে ও। নীল নীল শিরা বেরিয়ে পড়া আর কাঠির মত সরু হয়ে যাওয়া হাতটা দিয়ে আমার জামার অস্তিনটা আঁকড়ে ধরে ও আমাকে বসাতে বসাতে বলে উঠল, 'আমি চমৎকার আছি, সত্যি বেশ ভাল আছি আমি।'

ওর বুকের বোতামগুলো সব খোলা। শরীরটা একটা কাপড়ে ঢাকা, আর সেটা ঘামে সপ্‌সপে হয়ে গেছে। ওর চুলগুলো আঁচড়ান হয়নি, সেগুলো মুখের ওপর এসে পড়েছে। আমি আঙুল বুলিয়ে বুলিয়ে সেগুলোকে পেছনে সরিয়ে দিতে দিতে জিগ্যেস করলুম:

"আগের থেকে এখন কি একটু ভাল বোধ করছ?"

"ও উত্তর দেবার আগেই একটা পুলিশ আমাকে ঘরের থেকে বের করে দেবার চেষ্টা করল। ত্রোই'র হাতে তখনও আমার হাতটা ধরা। নিষ্ঠুর ভাবে এক হ্যাঁচকায় দস্যুটা আমাকে টেনে সরিয়ে দিল, আর আমার স্বামীকে বলল: 'তোমার অপরাধ স্বীকার কর। তা না হলে আমি তোমাকে সাধারণ পুলিশ দপ্তরে ফিরিয়ে নিয়ে যাব। সেখানে তোমার ওপর আরও নির্যাতন চালান হবে। সেও সহ্য করে থাকতে পারবে তো?'

ত্রোই উত্তর দিল। 'আমি কোন অপরাধে অপরাধী নই। আমি শুধু একটা কথাই স্বীকার করি—আমি ম্যাকনামারাকে খতম করার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু পেরে উঠিনি।'

'তুমি যদি অপরাধ স্বীকার না কর, তাহলে তোমার জন্যে কিছু বিশেষ দাওয়াইয়ের ব্যবস্থা করা হবে। তখন আবার বলো না যে আমরা খুব নিষ্ঠুর। তুমি যদি আমাদের কাছে সবকিছু খুলে না বল, তাহলে তোমার বউও জেলে পড়ে পচবে। ত্রোই তার দিকে শুধু উদ্ধত জলন্ত চোখ মেলে তাকিয়ে রইল—কোন উত্তর দিল না।

দস্যুটা ক্রুদ্ধ স্বরে বলল:

'আমি এই শেষ বারের মত তোমার জন্যে ছাড়া পাবার রাস্তা খোলা রাখতে পারি, কিন্তু তুমি তবুও তা প্রত্যাখ্যান করছ। যতদিন ধরে তুমি এখানে বন্দী

হয়ে পড়ে আছ তার সারা সময়টা ধরেই তুমি সরকারের নিন্দাবাদ করছ আর মার্কিন উপদেষ্টাদের উদ্দেশ্যে কাদা ছুঁড়ছ। এখানে তোমার সঙ্গীদের যা কিছু বলেছ, একটা টেপরেকর্ডার তার সবই ধরে রেখেছে। ওটা ফিরে চালিয়ে দেব, শুনবে তুমি কি বলেছ? তুমি মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিবকে খুন করার চেষ্টা করেছিল, আর এখন তুমি জাতীয় সৈন্যবাহিনীকে গালমন্দ করেছ, এমনকি প্রধান-মন্ত্রীকেও অপমান করেছ।'

'আমি কখনও আমার মনোভাব গোপন করিনি। সবসময়েই আমি পরিষ্কার সত্যি কথা বলেছি। তোমরা এমন সব খবরের কাগজ এনেছ যাতে গুণকীর্তন করে করে মার্কিন উপদেষ্টাদের একেবারে আকাশে তোলা হয়েছে, আর তাদের বলা হয়েছে ভিয়েতনামের বন্ধু বলে। আমি সেগুলো ছিঁড়ে ফেলেছি কারণ আমি মনে করি যে কাগজগুলো মিথ্যে কথা লিখেছে। আর আমি মনে প্রাণে এটা অনুভব করি যে আমার একান্ত কর্তব্য হলো যারা ঐসব কাগজগুলো পড়ে, আমায় তাদের একথা বোঝাতে হবে যে মার্কিন উপদেষ্টারা ভিয়েতনামের জনসাধারণের পরম শত্রু; আর আমাদের কর্তব্য হলো, তাদেরকে খতম করা—শেষ আমেরিকানটাকে পর্যন্ত।'

পুলিশটা কাগজপত্রের একটা ফাইল খুলল। ওর ইচ্ছে ছিল সেগুলো ত্রোইকে দিয়ে সই করিয়ে নেবে। লোকটা সেগুলো পড়ে শোনাল, তারপরে বললে:

'তোমাকে বলতে হবে, এই কাজের জন্যে ভিয়েৎকংদের কাছ থেকে তুমি ঠিক কত টাকা পেয়েছ?'

ত্রোই বিছানার থেকে একটুও উঠল না, শুধু মাথাটা একটু তুলে উত্তর দিল:

'আমি যে আমেরিকানদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি, সে টাকার জন্যে নয়, লড়াই করছি—আমি ওদের খতম করতে চাই বলে। যা কিছু আমি করেছি তার লক্ষ্য ছিল দক্ষিণ ভিয়েৎনামকে বিদেশীর কবল থেকে মুক্ত করা, তাদের শোষণ ও নিপীড়নের অবসান ঘটান। এই হলো মোট কথা।'

দস্যুটা আমার দিকে ফিরে বলল: 'তোমার স্বামীকে সব স্বীকার করতে বল, না হলে ওকে মরতে হবে।'

আমি দস্যুটাকে বললুম:

'আমি ওর কাজকর্ম সম্পর্কে কিছুই জানি না; আমি ওকে কি স্বীকার করতে বলব?'

বিছানার উপর লম্বা হয়ে শুয়েছিল ত্রোই। হাত দু'টো শরীরের দু'পাশে

ছড়ান। চোখ দু'টো ছাদের দিকে নিবদ্ধ। সংকল্পে দৃঢ়বদ্ধ মুখ, কিন্তু তাতে উত্তেজনার কোন চিহ্ন নেই, আর তার চারপাশে যারা রয়েছে, তাদের কারোও সম্পর্কেও কোন গ্রাহ্য নেই তার।

পুলিশটা বলল :

'তুমিই তো কংলি সেতু উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছিলে।'

'আমার উদ্দেশ্য ছিল মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব ম্যাকনামারাকে খতম করা।'

'নিজেকে খুন করে সমস্ত সূত্র নষ্ট করে ফেলার জন্যেই তুমি জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়েছিলে, তাই না ?'

'না, আমাদের মত লোকে কখনও আত্মহত্যা করে না। বাঁচবার জন্যে আর বেঁচে থেকে আমেরিকান আগ্রাসক দস্যুদের খতম করার কাজ চালিয়ে যাবার জন্যেই আমি জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়েছিলাম। যদি আমি মারা পড়তাম, তাহলে সেটা হত একটা দুর্ঘটনা মাত্র।'

দস্যুগুলো তাকে পালা করে জেরা করছিল আর তার কাজের পিছনে হাজারো রকমের অভিসন্ধি আবিষ্কার করছিল—যেগুলো ছিল নির্জ্জলা মিথ্যা অপবাদ। ত্রোইর বীরত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা তাকে সায়গণের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার, বিশেষ করে ছাত্র এবং অপরাপর তরুণ সম্প্রদায়ের হৃদয়ে গভীর শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, আর এই খুনেদের উদ্দেশ্য ছিল মিথ্যা অপবাদের কালি মাখিয়ে তাকে সেই আসন থেকে টেনে নামানো। তারা তাকে জোর করে উঠিয়ে বসাল, তারপর মিথ্যে কথায় ঠাসা এক গোছা কাগজপত্র তাকে দিয়ে জোর করে সই করিয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগল। কাগজপত্রগুলো পড়ে ত্রোই একটা কলম তুলে নিল, তারপর দাগ টেনে টেনে একটার পর একটা লাইন কেটে দিতে লাগল। ফলে শেষ পর্যন্ত কাগজপত্রগুলো একগাদা কাটাকুটি দাগে ভর্তি হয়ে গেল। তারপর কলমটা তাদের মুখের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার বিছানায় শুয়ে পড়ল।

এইভাবে জোর করে ওর কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করতে ব্যর্থ হয়ে ওরা ভয় দেখাতে লাগল যে এরপরে তার ওপরে আগের থেকে আরও অনেক বেশী অমানুষিক নির্যাতন করা হবে। ওরা আমাকে ধাক্কা দিয়ে দরজার দিকে ঠেলে দিলে আর ত্রোইর সঙ্গে একটাও কথা বলতে বারণ করে দিলে। উঠোনে পৌছে আমি থেমে গেলুম আর চীৎকার করে কেঁদে উঠলুম। কিন্তু তারপর যেই আমি ছুটে আমার স্বামীর কাছে ফিরে যাবার চেষ্টা করলুম—

ওমনি দু'টো দস্যু আমার হাত দু'টো খামচে ধরলে, তারপর আমাকে টেনে হিঁচড়ে গাড়ীতে নিয়ে গিয়ে তুললে।

জেলখানায় ফিরে আসতেই আমার জেল বান্ধবীরা আমাকে ঘিরে ধরল। ভগিনী 'অ' আর 'জ' আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করলে। এরপরে, যখনই তারা দেখতো যে আমার চোখ জলে ভরে উঠেছে, তখনই তারা নানা গল্প বলে, না হলে এটা-ওটা কাজের মধ্যে ঠেলে দিয়ে আমাকে আমার দুঃখ থেকে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করত। আমি তখন সবে দু'টো সাদা ধপধপে বালিশের ওসার সেলাই করা শেষ করেছি, ভগিনী 'জ' আমাকে শিখিয়ে দিলে কেমন করে তার ওপরে সূচ সুতো দিয়ে ফুল তুলতে হয়, আর ত্রোই এবং আমার নাম লিখতে হয়।

আঙ্গুলে পিন ফুটিয়ে অত্যাচার করার ফলে তখনও ওর হাত ফুলে রয়েছে, তা সত্ত্বেও ও প্রায়ই নিজে সূচ সুতো দিয়ে কাজটার কঠিন অংশটা কি করে করতে হবে তা দেখিয়ে দিত। ও বলতো, 'ওসার দু'টোতে ফুলটুল তোলা যখন শেষ হয়ে যাবে তখন ও দু'টো তোমার বরকে নিয়ে গিয়ে দিয়ে দেবে, আর তাকে বলো যে ওগুলো তোমাদের বিয়ের উপহার—৪ নম্বর সেলের বন্দিনীরা পাঠিয়েছে। যদিও একটু দেরী হয়ে গেছে, তবুও আমরা আশা করি যে, সে ওগুলো গ্রহণ করবে।' কাজটা করার সময় আমরা মৃদুস্বরে 'আমাদের যোদ্ধাদের জন্যে আমরা পোষাক বানাই' গানটা গাইতাম। ওটা ছিল ভগিনী 'জ'-এর প্রিয় গান।

একজন নতুন বন্দী এসেছিল জেলখানায়, চার বছরের ছোট্ট একটা বাচ্চা। তার ঠাকুরমার সঙ্গে তাকেও ধরে এনেছে। গোলগাল চেহারা, ছোট ছোট মোটা সোটা হাত,—দেখে মনে হত যেন চাষীদের ছেলে। প্রহরীরা তাকে উঠোনে ইচ্ছেমত ঘুরে বেড়াতে দিত। আমার সেল থেকে কিছুটা দূরের একটা সেলে তার ঠাকুরমাকে আটকে রেখেছিল। বাচ্চাটা প্রত্যেকটা সেলের সামনে দিয়ে হেঁটে যেত আর কৌতূহলী দৃষ্টিতে প্রত্যেকটার ভিতর উঁকি মেরে দেখত। কখন কখন আঙিনাতে যে সব পাখীরা ঝাঁক বেঁধে এসে বসত ও তাদের পিছনে মহা উৎসাহে ছুটোছুটি শুরু করে দিত আর আমাদের ডাকাডাকি করত পাখী ধরতে ওকে সাহায্য করবার জন্যে। একটা প্রহরী একটা মোটর সাইকেল চড়ে যাচ্ছিল। ও চেঁচিয়ে তাকে বলে উঠল: 'এই তুমি ত্রোই কাকুর সাইকেল চড়ছ কেন? এক্ষুণি ফেরৎ দাও, তা না হলে কাকুকে বলে দেব।' ওর অজ্ঞতা দেখে আমরা হেসে উঠলুম। হয়তো ত্রোই নামে ওর একটা কাকা আছে। একদিন

ও আমার নাম উল্লেখ করে আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইলে যাদের কাছে বলেছিল তারা ওকে ৪ নম্বর সেলে যেতে বলে। তখন ও আমার নাম ধরে ডাকতে লাগল 'কুয়েন কাকীমণি'! ও আমার নাম জানে দেখে আমি অবাক হয়ে গেলুম, তাই আমি জিগ্যেস করলুম 'কি চাই তোমার খোকন? আমিই কুয়েন কাকী'। ও একটা কমলালেবু বাড়িয়ে ধরলে আর বেশ স্পষ্ট উচ্চারণে বললে, 'কাকুরা তোমাকে এই কমলাটা দিতে বলেছে আর তুমি ভাল আছ কিনা জিজ্ঞাসা করেছে।'

গরাদের মধ্যে দিয়ে হাত বাড়িয়ে আমি তার হাতটা আমার হাতে তুলে নিলুম। কমলা ছাড়িয়ে আমি ওকে দিতে চাইলুম কিন্তু ও নিতে চাইলে না, মাথা নেড়ে বললে: 'কাকুরা আমাকে অনেক দিয়েছে।'

তার মোটা সোটা হাতটা তখনও আমার মুঠোর মধ্যে ধরা; আমি ওকে জিগ্যেস করলুম "তোমার নাম কি?"

"ড্যান।"

"আচ্ছা ড্যান, তুমি গিয়ে তোমার কাকুদের বল যে কুয়েন কাকী ভালই আছে আর তাদের অনেক, অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছে।"

ও স্পষ্ট স্বরে জোরে জোরে বললে: 'ঠিক আছে কাকীমণি', তারপর একছুটে পুরুষদের ব্লকের দিকে চলে গেল। ড্যান বেশ বুদ্ধিমান ছেলে। শীগগিরই ও জেলখানার ভেতরকার চারিদিকের পথঘাট সব চিনে ফেললে। অমানুসিক নির্যাতনের ফলে জেলখানার মধ্যে অনেক বন্দীই অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ত। অন্যান্য বন্দীরা তাদের খাবার দাবার পাঠিয়ে দিত। ড্যানকে ঐ কাজে লাগান হলো। আমাদের নির্দেশ মত এই সব খাবার দাবার নিয়ে হাত দু'টো পিছনে লুকিয়ে ও যখন এক সেল থেকে অন্য সেলে যাতায়াত করত তখন খুব সতর্কতার সঙ্গে ও প্রহরীদের এড়িয়ে যেত। ও প্রায়ই লোইকে সিগারেট এনে দিত। অল্প কয়েকদিন মাত্র আগে লোই এখানে এসেছে, আর তাকে আটকে রাখা হয়েছে আমার সেল থেকে অল্প কয়েক গজ দূরের একটা সেলে।

একদিন আমি একটা খাটুনির কাজের দলের সঙ্গে কাজ করছি, এমন সময় একজন পুরুষ বন্দী ছোট্ট ড্যানের হাত ধরে আমার কাছে এসে হাজির। সে আমাকে জিগ্যেস করল: 'একি ব্যাপার? তুমি তোমার ভাইপোকে চিনতে পারছ না? ছোট্ট ড্যান তোমার স্বামীকে চেনে, আর প্রায়ই তার কথা জিগ্যেস

করে। খুনেরা ওকে ওর ঠাকুরমার সঙ্গে জেলখানায় এনে পুরেছে, কারণ তাদের সন্দেহ যে ওর পরিবারের লোকজন ত্রোইর কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত আছে।'

তারপর ড্যানের দিকে ফিরে সে বললে :

'এই হল কুয়েন কাকী, ত্রোই কাকুর বউ। ওঁকে সুপ্রভাত জানাও ড্যান।'

বাচ্ছাটা শ্রদ্ধা জানাবার জন্যে হাত দু'টো বুকের ওপর ভাঁজ করে ধরে বিনীতভাবে বললে, 'সুপ্রভাত, কুয়েন কাকীমণি!'

তাকে কোলে টেনে নিয়ে আমি জিগ্যেস করলুম, 'তাহলে তুমি ত্রোই কাকুকে চেন? সত্যি সত্যি চেন তুমি তাকে?'

সে ঘাড় হেলিয়ে জবাব দিলে 'হ্যাঁ, কাকু প্রায়ই আমাকে নানা রকম মিঠাই এনে দিত। কাকু তার মোটর সাইকেল চড়ে আমাদের বাড়ী আসত।'

"এখন ত্রোই কাকু কোথায় আছে তুমি জান?"

'তাকে জেলে পাঠান হয়েছে।'

আমি ডুকরে কেঁদে উঠে ছোট ড্যানকে বুকে চেপে ধরলুম। যারা কিছুই জানতো না তারা ভাবলে আমরা দু'জন—মা আর ছেলে, অনেক দিন ছাড়াছাড়ির পর আবার আমাদের দেখা হয়েছে। ত্রোইর কথা তাহলে বাচ্ছাটার ভাল রকমই মনে আছে আর এটা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে সে ত্রোইকে খুব গভীরভাবে ভাল বাসত। সে সত্যি সত্যিই ভেবেছিল যে প্রহরীটা আমার স্বামীর মোটর সাইকেলটা চড়ে যাচ্ছে আর তাই সে সেটা ফেরৎ চেয়েছিল। এর কিছুকাল পরে আর একজন বন্দী জেলখানায় এসেছিল। সে আমাকে বলেছিল যে ত্রোই বাচ্ছাটাকে খুবই ভালোবাসত। ড্যানের যখন মাত্র ছ'মাস বয়েস, তখন 'পুতুল সরকারের' পতাকাকে অভিবাদন করতে আর 'কমিউনিস্টদের' নিন্দা করতে অস্বীকার করেছিল বলে খুনেগুলো তার মাকে গ্রেপ্তার করে এবং মারতে মারতে শেষপর্যন্ত তাকে শেষ করে ফেলে। তার বাবা ছিল খুবই গরীব। এক মুঠো অন্নের সংস্থান করতে তাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হত, ফলে ছেলের দেখাশোনা করার সে প্রায় কোন সময়ই পেত না। বাচ্ছাটার জন্যে ত্রোইর প্রাণ কাঁদত। ও প্রায়ই তাকে দেখতে আসতো, আর সঙ্গে আনতো নানা রকম মিঠাই। তাকে ধোয়ান গোছান, স্নান করান সবই ত্রোই করত। শিশুটার ঠাকুরমা প্রায়ই বলত; 'ড্যান তার বাবার চেয়ে ত্রোইর কথাই বেশী ভাবে।'

আমি ঠিক করলুম বাচ্ছাটাকে দেখাশোনা করার ব্যাপারে আমি আমার

স্বামীর স্থান গ্রহণ করব। জেলখানায় সেই নিষ্ঠুর দিনগুলোতে ও আমার অনেকখানি দুঃখের ভার হাল্কা করে দিয়েছিল। সারাদিন ধরেই সে বক বক করছে, একদণ্ডও তার কথার বিরাম নেই, আর তারই সঙ্গে আছে তার হাজারো প্রশ্নের মেলা। মাঝে মাঝে যখন আমার ওপর রেগে যেত, তখন জিব ভেংচিয়ে বলে উঠত, 'দাঁড়াও না আমি ত্রোই কাকুকে বলে দেব।' যখনই আমি ওকে কিছু ফল বা খাবার টাবার দিতুম তখন ওকে বলতুম, 'এটা হল ছোট্ট ড্যানের জন্যে তার ত্রোই কাকুর উপহার।' খুশিতে ওর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠতো। ও বলতো, 'বলনা কাকীমণি, ত্রোই কাকু কবে ফিরে আসবে?' কখনও কখনও সন্ধ্যেবেলা ওর ঠাকুরমার সেল থেকে ওরা গলা ভেসে আসতো, 'কুয়েনকাকী, ত্রোই কাকুর জন্যে কি তোমার মন কেমন করছে?' তার কথা শুনে সকলেই হাসিতে ফেটে পড়ত। তারপর চেঁচিয়ে তাকে ঘুমিয়ে পড়তে বলত।

ড্যানকে সারাক্ষণ ত্রোইর কথা বলতে শুনে অন্যান্য বন্দীরা মাঝে মাঝে কিছুটা রহস্য করে বলতো: 'ড্যানের মত ত্রোইর যদি একটা ছেলে থাকতো তো ও তাকে কি ভালোই না বাসতো।' এই কথায় আমার মনে পড়ে যেত—আমার স্বামীর কতই না ইচ্ছে ছিল যে আমাদের যেন একটা ছেলে হয়। ও বলেছিল, 'আমি যে মেয়ে পছন্দ করি না তা নয়; কিন্তু আমাদের প্রথম সন্তান ছেলে হলেই যেন আমি বেশী খুশী হব।'

আমার স্বামীকে আবার দেখতে পাবার জন্যে আমার প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। যদি পারি তাহলে যাবার সময় আমি ড্যানকে সঙ্গে নিয়ে যাবার চেষ্টা করব। এতে ও খুবই খুশী হবে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় ভগিনী কুয়েন আমাকে যে কাহিনী শোনাচ্ছিল তাতে ও নিজে আদৌ মন দিতে পারছিল না। সে বার বার তার হাত ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিল। এমন সময় পাশেরই একটা কামরা থেকে একটা সুরেলা নারী কণ্ঠ ভেসে এল, 'কুয়েন সময় হয়ে এল।'

এখানে যারা আছে সকলেই শুনেছে আগের রাত্রের হ্যানয় বেতারের সেই ঘোষণাটা: আজ রাত্রি ৮টা ৩০ মিনিটের সময় 'সুয়েন ভ্যান ত্রোই চিরকাল বেঁচে থাকবে' নামে চলচ্চিত্রটার কাহিনীর পূর্ণ বিবরণ বেতারে প্রচার করা হবে—এই চলচ্চিত্রটা এখন উত্তরে দেখানো হচ্ছে।

একেবারে শুরু থেকেই আমরা সকলে অনুভব করলুম যেন ত্রোই ধীর নির্ভীক পদক্ষেপে বধ্যভূমির দিকে এগিয়ে চলেছে আর আমরা তাকে অনুসরণ করে

চলেছি। বিবরণদাতার কণ্ঠস্বর কখনও তীব্র আবেগে রুদ্ধ হয়ে আসছে, আবার পর মুহূর্তে প্রচণ্ড ঘৃণায় জ্বলে উঠছে। এইভাবে তিনি আমাদের নিয়ে চললেন একটার পর একটা দৃশ্যের মধ্য দিয়ে: ত্রোই সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছে, ও এক টুকরো সবুজ সব্জীখেতের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল, ও চোখ বাঁধা কাপড়টা ছিঁড়ে ফেলল………

ট্রান্‌জিসটর রেডিওটাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে সারা দেহমন একাগ্র করে বিবরণী শুনছিল কুয়েন, মনে হচ্ছিল যেন রেডিওর লাউডস্পীকার থেকে বেরোনো প্রতিটি কথা, প্রতিটি শব্দ ওর দেহ মন শোষণ করে নিচ্ছে, আর সেই সঙ্গে প্রাণপনে চেষ্টা করছিল ও নিজেকে সাধ্যমত সংযত রাখতে, কিন্তু চোখের জল কি সহজে বাঁধ মানে? তার দুগাল বেয়ে অশ্রু ধারা বয়ে চলেছিল। আর তারই সঙ্গে কিছুক্ষণ পরপরই সায়গণের নারী প্রতিনিধিরা অব্যক্ত কান্নায় কেঁপে কেঁপে উঠছিল। তারপর পর্দার ওপর দৃশ্যের পরিবর্তন হলো: 'রাজধানীর' জনসাধারণ দিনরাত্তির বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে, মশালে মশালে রাস্তাঘাটগুলোকে দেখতে হয়েছে আগুনের স্রোতের মত। একটা অনুষ্ঠানে ত্রোইকে হ্যানয় বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের কর্মী বলে গ্রহণ করে সম্মান জানান হলো; আর তার একটা বিরাট প্রতিকৃতি থাই নুয়েন লৌহ ও ইস্পাত কমপ্লেক্স কারখানার সর্বোচ্চ স্থানে স্থাপন করা হলো। বিদ্যালয়ের পাঠকক্ষে তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হলো……। 'ও এখনও বেঁচে আছে: সারা উত্তর জুড়ে তার প্রতিকৃতি ছড়ান রয়েছে সর্বত্র—অরণ্যভূমি আর পর্বতমালা থেকে শুরু করে দ্বীপমালা পর্যন্ত—স্থলভূমি থেকে সমুদ্র পর্যন্ত…'। দক্ষিণ ভিয়েতনামের মুক্ত এলাকার একটা ছোট্ট বাড়ীতে আমরা দশবারজন বেতারে প্রচারিত এই বিবরণ শুনছিলাম, জাহাজের গায়ে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের শব্দের তালে তালে বেতার ভাষ্যকার দিবারাত্রি পিতৃভূমির পবিত্র পাহারায় নিরত একটা পেট্রল বোটে করে আমাদের নিয়ে চললেন ত্রোই-এর সঙ্গে এই অভিযানে। নিকটস্থ এলাকা সমূহের (দক্ষিণ ভিয়েতনামী মহিলা মহাসভার প্রতি যে এলাকা অনুরক্ত তার সর্বত্র) অসংখ্য রেডিও থেকে ভেসে আসতে লাগল কবি তো হু-র আবেগরুদ্ধ গম্ভীর কণ্ঠস্বর—তিনি তাঁর স্বরচিত কবিতা 'আমার কথাগুলো স্মরণ রেখো' আবৃত্তি করছিলেন। এই কবিতা আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে এই বেতার বিবরণী সমাপ্ত হলো। রেডিওটা বন্ধ করা হতে না হতেই সায়গনের মহিলা প্রতিনিধিদের মধ্যে উত্তেজিত আলোচনা শুরু হয়ে গেল। প্রত্যেকেই কিছু না কিছু বলতে চায়: 'উত্তরের অধিবাসীরা তাদের নিজেদের আত্মীয়-স্বজনদের যত

না ভালোবাসে তার চেয়ে বেশী ভালবাসে ত্রোইকে,—'ত্রোই এখন উত্তরে সত্যিকারের বেড়ান বেড়াচ্ছে।,—'ত্রোই উত্তরের সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছে' —'ত্রোই এখন রয়েছে নৌবাহিনীতে'। একজন অধ্যাপিকা, ভগিনী উ, ত্রোই-এর মৃত্যু সম্বন্ধে আমাদের আরও বেশ কিছু খবর শোনালেন :

ত্রোইর মৃত্যু অবলম্বনে উত্তরে যে ছবিটা তোলা হয়েছে সেটা সম্ভবতঃ দৈর্ঘ্যে ছোট। কারণ একটা স্কুলের ছাত্র—তার সাংবাদিক দাদা ত্রোইর প্রাণদণ্ডাদেশ কার্যকরী করার দিন চি-হোয়া জেলে উপস্থিত ছিল—সে তার স্কুলের বন্ধুদের বলেছে যে কয়েকজন সাংবাদিক ঐ সময়কার বিভিন্ন অবস্থায় ত্রোইর বেশ কয়েকটি ছবি তুলে নিতে পেরেছিলেন, বিশেষ করে ও যখন তাদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিল তখনকার। ফায়ারিং স্কোয়াডের বন্দুকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ত্রোই নিশ্চয়ই ভেঙে পড়বে আর তার বিরুদ্ধে যে সব অপরাধের অভিযোগ করেছে, তার অন্ততপক্ষে কিছুটা স্বীকার করবেই—এই মিথ্যে আশায় যুক্তরাষ্ট্র-থাঁন চক্র বহু বিদেশী সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ করেছিল। কয়েকজন ভাড়াকরা কলমপেশা লোক আর গুপ্তচরেরা তাকে উত্তেজক প্রশ্নের সাহায্যে চটিয়ে দিয়ে ফাঁদে ফেলবার জন্যে তৈরি হয়েছিল। কিন্তু ওরা যখন তাকে মৃত্যু দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত বন্দীদের সেল থেকে বেরিয়ে আসতে দেখল তখনই ওরা বুঝতে পারল যে ওরা তাকে কিছুতেই টলাতে পারবে না। ত্রোই সাংবাদিকদের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। উপস্থিত ব্যক্তিদের কেউ কেউ তার আসন্ন মৃত্যুদণ্ডের কথা ভেবে ভীত হয়ে পড়ল, কিন্তু ত্রোই নিজে শান্ত, অবিচল, উন্নতশির। সাংবাদিকদের সব প্রশ্নের একে একে উত্তর দিল, ত্রোই। আমি যে ছাত্রটির কথা বলছি সে তার দাদার কাছ থেকে যা যা শুনেছিল তার সবই বলেছিল। ত্রোই বলেছিল : আপনারা সাংবাদিক ; সুতরাং যা যা ঘটেছে সে সম্বন্ধে নিশ্চয়ই সব ভাল করে জানেন। আমেরিকানরা আমাদের দেশে অনুপ্রবেশ করেছে। তারা আমাদের দেশের জনসাধারণকে বিমান এবং বোমার সাহায্যে পাইকারী হারে খুন করছে। দক্ষিণ ভিয়েতনামকে গ্রাস করার জন্যে ম্যাকনামারা একটা ব্যাপক পরিকল্পনা রচনা করেছে। পিতৃভূমির প্রতি আমার ভালবাসার সীমা-পরিসীমা নেই। আমেরিকান দস্যুরা আমার দেশকে পদদলিত করবে—এ আমি কিছুতেই হতে দিতে পারি না। আমি আমার দেশবাসীদের স্বার্থ-বিরোধী কখনও কিছু করিনি ; আমি আমেরিকান বিরোধী, তাদের বিরুদ্ধেই আমি সংগ্রাম করেছি। আমি ম্যাকনামারাকে খতম করতে

চেয়েছিলুম, কারণ দক্ষিণ ভিয়েতনামে যে সব বর্বরতা, যে সব অমানুসিক অপরাধ ঘটছে তার বেশীর ভাগেরই মূলে আছে সে...... ।"

একজন সাংবাদিক তাকে প্রশ্ন করেছিল : 'মরবার আগে আপনার কি কোন অনুতাপ হচ্ছে ?'

ও সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছিল, 'আমি ম্যাকনামারাকে খতম করতে ব্যর্থ হয়েছি, এটাই আমার একমাত্র অনুতাপ ।'

একজন ক্যাথলিক ধর্মযাজক যখন তাকে পাপ থেকে পরিত্রাণ করতে গেলেন, তখন ও প্রত্যাখ্যান করলে, বললে, 'আমি কোন পাপ করিনি, আমেরিকানরাই পাপ করেছে ।'

জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ও উপস্থিত সকলকে বিস্ময়-বিমূঢ় করে রেখেছিল। প্রথম ঝাঁক গুলি ছোঁড়ার পরে, ওর বুকে গুলি লাগে, কিন্তু তবুও ও চীৎকার করে বলতে থাকে, "ভিয়েতনাম জিন্দাবাদ !" কয়েকজন সাংবাদিক কোনরকমেই আর কান্না সামলাতে পারেনি । তারা বিশ্বাস করতে পারেনি যে কেউ এত অবিচলিত-ভাবে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে পারে, তার দেশকে এত গভীরভাবে ভালবাসতে পারে । চোখ থেকে কালো কাপড়ের বাঁধনটা ছিঁড়ে ফেলে ত্রোই বলে উঠেছিল : 'না ! আমার এই দেশকে, এই প্রিয় মাতৃভূমিকে দু'চোখ ভরে দেখে নিতে দিতেই হবে তোমাদের ।'

বহু বছর ধরে "কমিউনিস্টদের কোন দেশ নেই" এই কথায় বিশ্বাস জন্মানোর চেষ্টা করে করে প্রতিক্রিয়াশীলরা এইসব লোকের মন বিষিয়ে দিয়েছিল ; কিন্তু এখন কয়েকজন সাংবাদিকের চোখে আসল সত্যটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। ভিয়েৎনামী পিতৃভূমিকে কমিউনিস্টরা যতটা ভালোবাসে আর কেউ ততটা ভালোবাসে না : তারা শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত ভালবাসে তাদের জন্মভূমিকে। তার শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত ত্রোই অটলভাবে সংগ্রাম করে গেছে। তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার খবর যে যে কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল, তার সবগুলোই অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। ড্যান ভূ মোই (নয়া গণতন্ত্র)-এর প্রতিটি কপিই বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। তার মৃত্যুদণ্ডের পূর্ণ বিবরণ পড়ার জন্যে জনসাধারণ অধীর হয়ে উঠেছিল, এমনকি ত্রোই যে তিন তিন বার চীৎকার করে "হো-চি-মিন জিন্দাবাদ" ধ্বনি তুলেছিল—সেটাও তারা বাদ দেয়নি ।'

[অনেক রাত পর্যন্ত কুয়েনের সহ-প্রতিনিধিরা তার স্বামীর বীরত্বপূর্ণ মৃত্যু-বরণের কথা বিশদভাবে আলোচনা করল। তারা ইচ্ছা প্রকাশ করল যে ত্রোইর

সমগ্র জীবন প্রতিফলিত হয় এরকম একটা চলচ্চিত্র যেন তৈরী করা হয়। এরপর সেদিন আর কুয়েন আমাকে ত্রোইর কাহিনী শোনাতে পারল না। তবে ও কথা দিল যে পরের দিন সন্ধ্যেবেলা আবার তার কাহিনী শুরু করবে।]

"একদিন সকালবেলা, আমাকে একদল পুরুষ বন্দীদের জন্যে পাণীয় জল ফোটাবার কাজে লাগান হয়েছিল—তারা একটা নতুন ব্লক তৈরি করছিল। হঠাৎ একজন পুলিশ আমাকে হেঁকে বললে, 'ফ্যান থি কুয়েন, তোমার জিনিসপত্র সব নিয়ে এক্ষুণি অফিসে গিয়ে হাজির হও।' আমার ভাগ্যে কি ঘটতে পারে সে সম্বন্ধে আমার মনে একটা ধারণা খেলে গেল। যে সব বন্দীদের এইভাবে অফিসে হাজির হবার হুকুম দেওয়া হত, তাদের দূরের কোন জায়গায় নির্বাসনে পাঠান হত। চারপাশে সবাই নানা কাজে ব্যস্ত ছিল—কেউ লোহার রড টুকরো করছিল, কেউ ইঁট আর সিমেন্ট বালি-মাখা বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তারা কাজ ছেড়ে দিয়ে এসে আমায় ঘিরে দাঁড়াল। সকলেই কিছু একটা বলে আমায় সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করতে লাগল। তারা বললে, যেখানেই আমাকে পাঠাক না কেন আমি যেন আমার স্বামীর—যে এরকম একজন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সংগ্রামী পুরুষ, তার যোগ্য হবার চেষ্টা করি।

সেই মুহূর্তে আমার একমাত্র কামনা ছিল এই যে আমার ভাগ্যে কি ঘটেছে সে কথা যেন ত্রোইকে বলা হয়; যাতে আমি গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা না করলেও যেন চিন্তা না করে। আমি আমার চারপাশে লোকজনদের বললুম: 'আমার ধারণা ত্রোইর স্বাস্থ্য কিছুটা ফিরলেই ওকে আবার এখানে ফিরিয়ে আনবে। কিন্তু যদি অন্য কোন জেলখানাতেও আপনাদের কারো সঙ্গে ওর দেখা হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে ওকে বলবেন যে যতদিন আমি এখানে ছিলুম, সারা সময়টা আমি ভালই ছিলুম—আনন্দেই ছিলুম। ওকে বলবেন যে ওরা আমাকে অন্য জায়গায় চালান করে দিয়েছে, আর সে জায়গাটা যে কোথায় এখনও তা আমি জানি না। যদি আমি অনেকদিন আর ওর সঙ্গে দেখা করতে না পারি, তাহলে আমার জন্যে চিন্তা ভাবনা করতে বারণ করবেন। ওকে এ কথাও বলবেন যে আমার ছাড়া পাবার পর আমি ওর পথ চেয়ে বসে থাকব, যদি ওর যাবজ্জীবনও কারাদণ্ড হয় তবুও।"

"আমার চারপাশের লোকজনের মধ্যে একজন ছিল যার সারা কাঁধ আর ঘাড় কাটা দাগে ভর্তি। তার পরিবারের লোকজন তার জন্যে যে খাবার দাবার নিয়ে আসতো সে প্রায়ই আমাকে ভাগ দিত। সে আমাকে বলল: 'কিছু ভেব না.

তুমি, ত্রোইর সঙ্গে যখন আমাদের দেখা হবে তখন আমরা তাকে বলব তার বউ জেলের মধ্যে কেমন ভাবে ছিল। শুনে ও খুবই খুশী হবে। আমাদের দেশ শীগগিরই আবার মুক্ত হয়ে যাবে আর তোমরা দু'জনেও আবার মিলিত হবে। এখন মনে আনন্দ আনো।' তারা সকলেই ত্রোইকে গভীরভবে শ্রদ্ধা করত, আর আমার প্রতিও ছিল ওদের গভীর সহানুভূতি। ওদের মধ্যে দেশের উত্তর মধ্য, দক্ষিণ—সব অঞ্চলেরই লোক ছিল। তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই অকর্মণ্য হয়ে পড়েছিল বা তাদের স্বাস্থ্যের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়েছিল। সাধারণ পুলিশ দপ্তরের অধীন এই জেলখানায় আসার আগে, ওদের মধ্যে অনেকেই আর সব রকমের জেলখানাতে আটক ছিল। যেমন, বি. ৪১, লে ভ্যানডুয়েট, ফু লোই, বিয়েন থোয়া, থু দাক, গিয়া দিন ইত্যাদি।

আমি যখন মেয়েদের ব্লকে ফিরলুম, তখন সকলেই জেনে গেছে যে আমি এবং আরও কয়েকজন—তাদের মধ্যে ছোট্ট ড্যান আর তার ঠাকুরমাও আছে, আমরা নির্বাসনে চলেছি। ওরা আমার জন্যে নানা উপহার দ্রব্য নিয়ে এলো: জামাকাপড়, সাবান, তোয়ালে, আর খাবার দাবার যাতে নতুন জেলখানায় আমাকে বেশী কষ্ট পেতে না হয়। প্রত্যেকেই আমাকে কান্নাকাটি করতে বারণ করছিল, কিন্তু ওদের নিজেদেরই দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল। ভগিনী 'জ'—আমার গান আর সেলাই-এর 'দিদিমণি' আমাকে ছোট্ট একটু উপদেশ দিলেন: 'কান্নার চেয়ে গান গাইবে বেশী করে; আর যদি না কেঁদে একেবারে না থাকতে পার, তাহলেও শত্রুর সামনে কখনো কাঁদবে না।'

যে কয় মিনিট হাতে ছিল, সেই সময়টার মধ্যে আমি পুরুষ বন্দীদের যে কথা বলেছিলুম, সেই কথাই আবার মেয়ে বন্দীদেরও বললুম। তারপর যখন আমি ড্যান-এর হাত ধরে উঠোনে বেরিয়ে এসেছি, তখন ভগিনী 'জ' আমাকে পিছন থেকে ডাকল। সে আমাকে কথাটা আর একবার মনে করিয়ে দেওয়া দরকার বলে মনে করেছিল:

'মনে রেখো স্ত্রীদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে শত্রুরা প্রায়ই তাদের স্বামীদের ওপর প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করে। যখনই তোমাকে ডেকে নিয়ে যাবে তখনই খুব সতর্ক হয়ে থাকবে, কিছুতেই ওদের ফাঁদে পা দেবে না; আর কখনও ত্রোইর ওপর ভারবোঝা হয়ে প'ড়োনা।'

কিন্তু একটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ঘটল। জেলখানার অফিসে এক ঘণ্টার মত সময় অপেক্ষা করার পর ছোট্ট ড্যান তার ঠাকুরমা আর আমি—

আমাদের তিনজনকেই ওরা ছেড়ে দিলে। কোন কারণ অবশ্য দেখালে না। আমি অন্যান্য বন্দীদের খবরটা বলবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু প্রহরীরা আমাকে সে সুযোগ দিলে না।"

"আমি আবার কটনউল প্যাক করার কাজে ফিরে গেলুম। আমি দুপুরে আর রাতে অতিরিক্ত সময় ধরে খাটতে লাগলুম, যাতে করে ত্রোইর জন্যে মাঝে মাঝে কিছু খাবার দাবার কিনে নিয়ে যেতে পারি, আর আমাদের বিয়ের সময়কার খরচ-পাতিগুলো শোধ করতে পারি। তাকে চো কুয়ান বলে অন্য একটা হাসপাতালে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। এই হাসপাতালে যে সব বন্দীদের রাখা হত, বিশেষ করে যাদের তখনও বিচার শুরু হয়নি, তাদের সঙ্গে দেখা করার নিয়ম কানুন ছিল অত্যন্ত কড়া। যত বারই এখানে ত্রোইকে দেখতে গেছি ততবার আমি একাই শুধু হাপুস নয়নে কাঁদিনি ; বন্দী অবস্থায় চো কুয়ান হাসপাতালে চিকিৎসার জন্যে রয়েছে এমন আত্মীয় স্বজনকে যারাই দেখতে যেতো তাদেরই দু'গাল বেয়ে চোখের জলের ধারা নামতো। কারণ ওখানকার রীতিনীতি ছিল সত্যই অমানুষিক। ত্রোইর সঙ্গে আমার দেখা করাটা সাধারণতঃ হত এই রকমের : ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে দরজার একটা ছিদ্রের ভিতর দিয়ে উঁকি মেরে আমি ভেতরের উঠোনটা দেখার চেষ্টা করতুম। প্রায় পনের গজ দূরে একটা দেয়াল, তার ওপর লোহার শিক লাগান-তার। ওপারে দাঁড়িয়ে থাকতো ত্রোই। আমি তার শরীরের ওপরের অংশটা দেখতে পেতুম, কিন্তু ও দেখতে পেত কেবল একজোড়া চোখ : ও যাতে বুঝতে পারে যে আমি ওকে দেখতে এসেছি, সে জন্যে আমাকে চীৎকার করে ওকে ডাকতে হত। তাদের প্রিয়জনদের এক ঝলক মাত্র চোখের দেখা দেখতে পাবার জন্যে বহু লোক এসে হাজির হত সেখানে, তাদের সবাইকেই একে একে এই ছিদ্রের সামনে এসে দাঁড়াতে হত ; ফলে একজন তার স্বামী বা ছেলেকে চিনে বের করতে পেরেছে,—কি-না পেরেছে, অমনি আর একজন জায়গা পাবার জন্যে ঠেলাঠেলি শুরু করে দিত। আমি প্রথমবার যখন এসে এই লোহার ফটকের পাশে অপেক্ষা করছিলুম, তখন এক মহিলা আমাকে আর আশপাশের অন্যান্য সকলকে বললেন :

'আমার স্বামী যে এইখানে বন্দী হয়ে আছে এটা খুঁজে বের করতে আমার চার বছর লেগেছে। শেষবার যখন আমি এসেছিলুম তখন আমার ছেলেই কেবল কোনরকমে তার বাবাকে এক ঝলক দেখতে পেয়েছিল। দয়া করে ছিদ্রটার কাছে

আমাকে একটু বেশী সময় থাকতে দিন, কারণ শীগগিরই আমাকে হুয়েতে ফিরে যেতে হবে।

গতবার তাঁর আট বছরের ছেলে তার বাবাকে এক ঝলক দেখতে পেয়ে একটা পুলিশের পিছু পিছু চুপি চুপি উঠোনে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু শেষে ধরা পড়ে যায়। তখন দস্যুগুলো ওকে মারধোর করে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়। বড় ফটকটার পাশে পুলিশদের যাতায়াতের জন্যে একটা ছোট ফটক ছিল। এই ফটকে রুগ্ন বন্দীদের কাছে পাঠাবার জন্যে খাবার দাবার জমা দেওয়া যেত। একবার দারোয়ানটা যখন ত্রোইর জন্যে নিয়ে যাওয়া খাবারের মোড়কটা আমার কাছ থেকে নিচ্ছিল, সেই সুযোগে আমি দু'এক মিনিটের জন্যে দরজাটা খোলা রাখতে পেরেছিলুম। আমাকে দেখে ত্রোই আনন্দে অধীর হয়ে পড়েছিল। ও চেঁচিয়ে জিগ্যেস করলে :

'তুমি ছাড়া পেয়েছ, তাই না ?'

"হ্যাঁ।"

'কেমন আছ তুমি ?'

"খুব ভাল আছি।"

ক্রাচের ওপর ভর দিয়ে ও লোহার গরাদে লাগান জানলাটার কাছে এগিয়ে এল, তারপর হাতটা গরাদের মধ্যে দিয়ে বের করে আমার দিকে নাড়িয়ে আনন্দ প্রকাশ করলে। কিন্তু আমি ওর উদ্দেশ্যে আর একটা কথাও বলতে পারলুম না, তার আগেই দরজাটা আমার মুখের ওপর দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল।

আমি এক ছুটে বড় ফটকের ছিদ্রটার কাছে গিয়ে ভিতরে উঁকি মারলুম। ও তখনও লোহার শিকগুলো আঁকড়ে ধরে রয়েছে, ওর মুখে একটা বিষাদময় হতবুদ্ধির ভাব। আমি ওর নাম ধরে ডাকলুম, ছিদ্রটার মধ্যে দিয়ে হাত গলিয়ে দিয়ে ওর দিকে নাড়ালুম। ভেতরের প্রহরীটা আমাকে চীৎকার করে গাল পাড়তে লাগল, তারপর একটা পাথর ছুঁড়ে মারলে, ভাগ্যক্রমে সেটা গায়ে না লেগে ফটকের ওপর দড়াম করে এসে লাগল। দুঃখে বেদনায় আমার স্বামীর অন্তর চুরমার হয়ে গেল, ও চীৎকার করে বললে : 'কুয়েন, সোনা আমার সপ্তাহে মাত্র একবার কি দু'বার আমাকে দেখতে এসো। এইভাবে সপ্তাহে বারবার আমাকে দেখতে আসা তোমার চলবে না, কারণ, দেখতেই পাচ্ছ, প্রতিবারই এটা কি যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপারই না হয়। তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ, কুয়েন ?'

বুকভেঙে বেরিয়ে আসা কান্নাকে জোর করে থামিয়ে, আমি উত্তর দিলুম : "এর থেকে যদি দশগুণ বেশী বেদনাদায়কও হত, তা হলেও আমি তোমাকে বারবার দেখতে আসতুম। আমার জন্যে তুমি কোন ভাবনা করো না, লক্ষ্মীটি।"

ত্রোইকে যথেষ্ট খাবার দাবার এনে দেবার আশা তবুও আমি ছাড়লুম না। আর তার জন্যে সব রকমের চেষ্টা করে যেতে লাগলুম। আমি জানতে পেরেছিলুম যে চো কুয়ানের রুগ্ন বন্দীদের ধীরে ধীরে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হত। সেখানকার খাবার দাবার ছিল দূষিত। সংক্রামক রোগের রোগী, যেমন : যক্ষ্মা, এমনকি গলিতকুষ্ঠ হয়েছে এমন সব রোগীদের সঙ্গে একসঙ্গে আটকে রাখত বন্দীদের। ত্রোই যাতে নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরে পায় তার জন্যে আমি ওকে সাহায্য করতে চেয়েছিলুম, যাতে ও যখন এর পরের বার পালাবার চেষ্টা করবে তখন ওর সফল হবার সম্ভাবনা বেশ বেশী থাকে।

আমার মা-ও ওকে দেখবার জন্যে ব্যাকুল হয়েছিলেন, কিন্তু এতদিন পর্যন্ত আমি তাঁকে দেখতে আসার থেকে ঠেকিয়ে রেখেছিলুম। তাঁর আদরের জামাই-এর সঙ্গে তিনি এক-অধটা কথাও বলতে পারবেন না—এটা তাঁর পক্ষে সাংঘাতিক রকমের বেদনাদায়ক হবে। কিন্তু এবার আর তিনি কোন কথা শুনতে চাইলেন না; এর পরের বার আমি যখন দেখা করতে যাব তখন আমার ছোটবোন ক্যানকে নিয়ে আমার সঙ্গে যাবার জন্যে পেড়াপিড়ি শুরু করলেন।

তিনি বললেন : 'ওকে এক মিনিট, এমনকি এক মুহূর্তের জন্যে দেখতে পেলেও আমার প্রাণটা ঠাণ্ডা হবে। ওর জন্যে আমার প্রাণটা যে কী রকম হু-হু করছে, তা যদি জানতিস!

আমার মা আমার স্বামীকে খুবই ভালবাসতেন। তাঁর এগারজন ছেলেমেয়ে, কিন্তু তিনি তাঁর এই জামাইটিকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসতেন। আমাদের বাড়ী ছিল থান থেই নামে কাছাকাছি শ্রমিকদের এক বসতি অঞ্চলে। সেখানে একবার আগুন লেগে গিয়েছিল। তখন আগুন নেভাতে সাহায্য করার জন্যে একদল শ্রমিক তাদের কাজকর্ম ফেলে দৌড়ে এসেছিল। ত্রোইও ছিল তাদের মধ্যে। নিজের হাতে বয়ে বাড়ীর বাইরে নিয়ে এসে ও-ই আমাদের বেশীর ভাগ জিনিসপত্র আগুনের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল। তারপর থেকে সেখানকার অধিবাসীরা ওকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখত, আমার মা তো ওকে প্রচণ্ড রকমের স্নেহ করতে শুরু করলেন। তাই, আমার মাকে সঙ্গে আনতেই হলো। সেবার আমার ভাগ্যটা

ভালই ছিল, কারণ আমি ফটকটা দু'-এক মিনিটের জন্যে খোলা রাখতে পেরে-ছিলুম। আমার স্বামীকে দেখতে পেয়েই আমার মা চীৎকার করে বলে উঠলেন: 'তু*, 'বাবা আম্মার, এই দেখ আমি, মা, তোমাকে দেখতে এসেছি। তুমি ভাল আছ তো, বাবা?'

ছোট্ট ক্যান উত্তেজিত ভাবে চেঁচিয়ে উঠল। "তু দাদা, তু দাদা।"

ত্রোই হেসে কি যেন বললে; কিন্তু আঙিনার ভিতরের এবং বাইরের সর্বত্রই কান্না আর চীৎকারে ভরে গেছে, সেই প্রচণ্ড সোরগোলের মধ্যে আমি ওর কথা কিছুই বুঝতে পারলুম না। মা'র দু'গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছিল। সেই অবস্থায় তিনি বহুক্ষণ ধরে ফটকটার কাছে ঘোরা-ফেরা করতে লাগলেন। দশ বারজন মা, তাঁরা যে একই দুর্দশার শিকার তারই কথা বলাবলি করছিলেন। একটা পুলিশ একটা গাড়ীর থেকে নেমে পায়ে পায়ে তাঁদের কাছে এগিয়ে গেল, তারপর তাঁদের মধ্যে একজনকে বলল: 'তুমি এখানেও আবার এসে হাজির হয়েছ? যেখানেই যাই সেখানেই তোমার সঙ্গে দেখা। তোমার মেয়ে এখানে কেন, তার অসুখ করেছে নাকি?'

মহিলাটি পুলিশটার দিকে ফিরে তাকালেন, কিন্তু কোন কথা না বলে, কঠিন চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি তাঁকে 'ম' মাসী বলে চিনতে পারলুম, তাঁর সঙ্গে আমার কয়েক দিন আগে একবার দেখা হয়েছিল। সেদিনটা ছিল আগের সপ্তাহের বুধবার; প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিল সেদিন। ফটকটাকে আঁকড়ে ধরে আমি সেই ছোট্ট চারকোণা গর্তটার মধ্যে দিয়ে ভিতরে উঁকি মারলুল, কিন্তু বৃষ্টির ধারার মধ্যে দিয়ে আমি আমার স্বামীকে স্পষ্টভাবে দেখতেই পেলুল না। আমি ওকে চেঁচিয়ে ডাকবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু সেই প্রচণ্ড বৃষ্টির আওয়াজে আমার গলার স্বর ডুবে গেল। ততক্ষণে আমি জলে ভিজে সপসপে হয়ে গেছি। হতাশায় ভেঙে পড়ে ফটকটার গায়ে ভর দিয়ে আমি কাঁদতে শুরু করলুম। এমন সময় কে যেন একজন আমার কাঁধের ওপর একটা বর্ষাতি ঢাকা দিয়ে আমাকে কাছাকাছি একটা বাড়ীর ছাচের নীচে টেনে নিয়ে গেল। তিনিই হলেন 'ম' মাসী। যখন তিনি শুনলেন যে আমি ত্রোই-এর বউ তখন তিনি আমাকে বুকে

* তু (চতুর্থ), মা-বাবার প্রায়ই তাদের ছেলেমেয়েদের, তাদের বয়স অনুসারে ডাকেন।'

টেনে নিলেন, তারপর বললেন, 'আমার আগেই সেটা অনুমান করা উচিত ছিল। আমি তোমাকে অনেকবার এখানে ঘোরাফেরা করতে দেখেছি।'

এখন সেই পুলিশটা বললে :

'তোমাকে আমি আগেই বলেছি—বলে-কয়ে যা হোক করে তোমার মেয়েকে এইটুকু শুধু রাজী করাও—ও একবারের জন্যে হলেও পতাকাটাকে সেলাম করুক, আর স্বীকার করুক যে কমিউনিস্টরা সন্ত্রাসবাদী ছাড়া কিছুই নয়—তা হলেই ওকে সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দেওয়া হবে। ওর একটু যত্ন-আত্তি করার জন্যে ওর পিছু পিছু এক জেলখানা থেকে আর এক জেলখানায় তুমি চার পাঁচ বছর ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছ, আর নিজে অসহ্য কষ্ট ভোগ করছ।'

'ম' মাসী উত্তর দিলেন :

'আমি ওকে গর্ভে ধরেছি, তাই আমার কর্তব্য হলো ওর যত্ন-আত্তি করা : কিন্তু তোমাদের পতাকাকে ও সেলাম করবে কি করবে না, ও কমিউনিস্টদের ভাল মনে করে, না খারাপ মনে করে—সে সব ওর নিজের ব্যাপার। আমি আমার মেয়ের ওপর কোন মতামত জোর করে চাপিয়ে দিতে পারব না।'

দশবারের বার আমি যখন ত্রোইকে দেখতে চো কুয়ান হাসপাতালে গেলুম ও আর তখন সেখানে ছিল না। দারোয়ানটা ভাসা ভাসা ভাবে আমাকে বললে, 'তোমার স্বামী সুস্থ হয়ে উঠছিল, তাই তাকে আবার জেলখানায় ফেরৎ পাঠান হয়েছে।'

আমি যেমন সন্দেহ করেছিলাম ঠিক তাই—ত্রোইকে সাধারণ পুলিশ দপ্তরের সেলে ফেরৎ পাঠান হয়েছিল। জেলখানা থেকে পালাবার পরে ভগিনী 'জ' পরবর্তীকালে ত্রোই সম্বন্ধে এই কাহিনীটা আমাকে বলেছিল :

সেদিন ৪ঠা আগস্ট সকালবেলা। জেলখানার উঠোনে তখনও কাজকর্মে রত বন্দীদের ভীড়। এমন সময় হাসপাতালের একটা গাড়ী মেয়েদের ব্লকের সেলগুলোর ঠিক সামনে এসে দাঁড়াল, গাড়ীটার দরজাটা সবে মাত্র খুলেছে----এমন সময় আমরা শুনতে পেলুম গাড়ীটার ভেতরে কে যেন উঁচু জোর গলায় বলছে, 'আমি নিজে নিজেই হাঁটতে পারব।' তারপর আমরা দেখতে পেলুম একজন বন্দী হাত নাড়িয়ে দু'জন পুলিশ বদমাসকে সরিয়ে দিল। কিন্তু লোকটা হাঁটতে পারল না। তার একটা পা আগাগোড়া ব্যাণ্ডেজ জড়ান। সেই পা-টা ঘসড়াতে ঘসড়াতে সে গাড়ীর মেঝের ওপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে আসতে লাগল। তার পরণে ছিল একটা হাফ প্যাণ্ট আর একটা ছাই রঙের শার্ট। যখন সে মুখ তুলে তাকাল,

তক্ষুণি আমি তাকে চিনতে পারলুম, আর চেঁচিয়ে উঠলম : 'এই যে, ত্রোই ফিরে এসেছে।' সমস্ত মেয়ে বন্দীরা একছুটে বারান্দায় চলে এল, যদিও সেটা ছিল একদম বারণ। প্রত্যেকেরই মনপ্রাণ আনন্দে ভরে উঠল। সকলে বলতে লাগল : 'এই তো কুয়েনের স্বামী। ত্রোই আবার ফিরে এসেছে।' খবরটা সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সেলগুলোতে ছড়িয়ে পড়ল, আনন্দ ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠল। 'ত্রোই ভাই ফিরে এসেছে'----পুরুষ বন্দীরা দৌড়তে দৌড়তে এসে হাজির হলো, তাদের সারা শরীর বেয়ে ঘাম ঝরছে, তাদের হাতে পায়ে একপর্দা করে পুরু কাদা আর সিমেণ্ট বালি-মাখা লেপ্টে রয়েছে। গাড়ীটাকে ঘিরে ধরে তারা উত্তেজিত স্বরে প্রশ্ন করতে লাগল, 'কই ত্রোই কোথায় ?' 'ততক্ষণে ত্রোই দরজার কাছে পৌছে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে দশবারজন গাড়ীটার পিছন দিকে ঘেঁসে পিঠ পেতে দাঁড়াল। ত্রোই হাত বাড়িয়ে এক জনের পিঠটা আঁকড়ে ধরল, আর ওর গালটা রাখল তার, সেই কমরেডের গালের ওপর। অন্যান্যরা তার শরীরটা আর পা ছু'টো ধরে রইল। সমস্ত ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেল যে জল্লাদগুলো একদম হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল। তারা চীৎকার করতে লাগল আর গালাগাল পাড়তে লাগল, 'ভাগো এখান থেকে। কে তোমাদের এই পাজীটার কাছে আসতে দিয়েছে ?' তারপর তারা ত্রোইকে তার বন্ধুদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করলে, কিন্তু পারলেনা। লোহার গরাদে লাগান জানালাগুলো আঁকড়ে ধরে আমরা মেয়ে বন্দীরা তীব্রকণ্ঠে চীৎকার করে বদমাসগুলোকে বলতে লাগলুম, 'এই শুয়োরগুলো, তোদের কি রকম আক্কেল, যে তোরা একজন আহত লোকের ওপর জুলুম করছিস ? অমানুসিক, একেবারে অমানুসিক ব্যবহার এটা।' পুরুষ বন্দীরা ত্রোইকে চারপাশ থেকে ঘিরে রেখে' 'সি' বাড়ীটায় নিয়ে এল ; নতুন যে বন্দীই আসে তাকেই প্রথমে সেখানে নিয়ে যায় তার কাগজ পত্র দেখবার জন্যে। একটা আরাম কেদারার ওপর তাকে বেশ আরামে বসিয়ে দিয়ে তবে বন্দীরা তাকে ছাড়ল। আর তারপর তাদের সেই এক ঘেয়ে কঠোর খাটুনি আবার শুরু করতে চলে গেল। 'পরের দিন ৫ই আগস্ট, সকালবেলা ত্রোইকে বিচারের জন্যে নিয়ে যাবে বলে তার সেল থেকে বের করে আনল। তার বন্ধু লোই-এর ওপর ভর দিয়ে বহু কষ্টে সে মেয়েদের সেলের ব্লকটার দূরপ্রান্ত পর্যন্ত হেঁটে গেল, আর তাকে নিয়ে যাবার জন্যে গাড়ী না আসা পর্যন্ত সেখানে অপেক্ষা করে রইল। এরপর অল্প একটু থামল ভগিনী 'জ'। তারপর যাকে ও তার জীবনের 'সেই দশটি অমূল্য মিনিট' বলে—যে-সময়ে ও ত্রোইর খুব কাছে থাকতে

পেরেছিল, সেই সময়ের একটা বিশদ বিবরণ শোনাল আমাকে : 'আমি ওর থেকে পুরো তিনগজও দূরে ছিলুম না। জেল বাড়ীটার নকশাটা তো তোমার মনে আছে, তাই না? মেয়েদের ব্লকের মুখোমুখি থাকে জেলখানার গাড়ীর যাওয়া-আসার তদারক করে যে ওয়ার্ডারটা তার ছোট টেবিলটা। ত্রোই টেবিলটার পাশে একটা চেয়ারে বসেছিল। একটা ছাইরঙের জামা আর একটা নীল রঙের পাৎলুন তার পরণে, আর তার চুলগুলো ছিল পরিপাটি করে আঁচড়াণ। হাস-পাতালে যখন তুমি ওকে দেখেছিলে তখন ও যে রকম রোগা ছিল, এখন আর ততটা রোগা ছিল না, বরং ওকে বেশ স্বাস্থ্যবানই দেখাচ্ছিল। ওর মুখে হাসি ছিল না, তবে একটা খুশীখুশী ভাব নিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে ছিল। বদমাস-গুলো চাইছিল না যে আমরা ওর কাছে যাই, বরং আমাদের মারধর করার ভয় দেখিয়ে সেখান থেকে ভাগিয়ে দেবারই চেষ্টা করছিল। কিন্তু আমরা, দশবার-জনের বেশীই হব সেখানে বসেই রইলাম। এক পা-ও নড়তে রাজী হলুম না। শেষ পর্যন্ত আমাদের থাকাটা ওদের মেনে নিতেই হল। ত্রোই একটু ঘুরে মেয়েদের ব্লকের দিকে মুখ করে বসে রইল। তার দু'চোখে একটা উজ্জ্বল দীপ্তি ঝিলিক দিচ্ছিল : মনে হচ্ছিল ও হেসে আমাদের কিছু বলতে চাইছে। আমরা ফিস্‌ফিস্ করে একে অন্যকে মনে করিয়ে দিচ্ছিলুম তোমার খবরটা ওকে দেবার জন্যে, কিন্তু আমরা তা পারিনি। চারটে বদমাস ওকে ঘিরে পাহারা দিচ্ছিল ; তাদের মধ্যে তিনজন এক মুহূর্তের জন্যেও ওকে ছেড়ে যায়নি। তোমার হয়তো পাজীগুলোকে মনে আছে : গিয়াপ, লুক আর তামহিয়েউ। তখনও দু' এক মিনিটের বেশী হয়নি। ত্রোই সেখানে এসে বসেছে, এমন সময় লুক—হাড় বের করা শুঁটকো মুখো পাজীটা ওকে ব্যঙ্গ করে জিগ্যেস করলে :

'এখন তোমার বয়স অল্প আর আমি জানি তোমার বৌয়ের বয়সও বেশী নয়, আর সে দেখতে বেশ সুন্দরী ; তাছাড়া তোমাদের বিয়েও হয়েছে মাত্র অল্প কয়েকদিন। তবুও তোমার নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দের কথা ভাবছ না কেন তুমি? ভিয়েৎকংদের চালাকীতে ভুলে এরকম একটা অপরাধ করতে গেলে কেন?'

আমাদের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল ত্রোই। তারপর শ্লেষের হাসি হেসে উত্তর দিলে : 'অপরাধ? আমার ভবিষ্যতের কথা ভেবেছি বলেই আমি এ কাজ করতে পেরেছি। আমেরিকান আগ্রাসক দস্যুদের খতম করাকে কি কেউ অপরাধ বলে?'

'তুমি ঠিক কাজ করেছ একথা বলছ কি করে? একটা ঠ্যাঙ ভেঙ্গে পঙ্গু হয়ে

পড়ে আছ—ভিয়েৎকংদের হয়ে কাজ করে এই তো তোমার লাভ হয়েছে।' এইবার জল্লাদগুলোর চোখে চোখ রেখে গলা চড়িয়ে উত্তর দিল ত্রোই, 'কেউ আমাকে ভুলিয়ে এ কাজ করায়নি। আমেরিকান আগ্রাসক দস্যুদের আমি মনে প্রাণে ঘৃণা করি। আমি ঘৃণা করি ম্যাকনামারাকে----কারণ দক্ষিণের ওপর এই অমানুষিক নির্যাতন নিপীড়ণের মূল হোতা হল সে। সেই জন্যই আমি তাকে খুন করতে চেয়েলুম।'

গিয়াপ, গিয়াদিন জেলখানার সেই কুখ্যাত বদমাসটা, ত্রোইর মুখোমুখি বসে ছিল। এবার সে বলে উঠল, 'তার ফলটা যা হয়েছে সেটাতো খুবই পরিষ্কার, তাই না? এতে তোমার কোন লাভই হয়নি। শুধু তুমি তোমার একটা ঠ্যাং ভেঙেছ আর জেলখানায় পড়ে পচ্ছ।' রাগে ত্রোইর মুখ লাল হয়ে গেল। টেবিলের ধারটা শক্ত করে চেপে ধরে ও প্রতিটা শব্দের ওপর জোর দিয়ে ধীরে ধীরে বললে:

'তোমাদের সকলকে এই একটা কথা স্পষ্ট করে বলছি: আমি অত্যন্ত সংগত কাজ করেছি। আমি আগ্রাসক দস্যুদের খতম করতে চেষ্টা করেছিলুম। এরজন্যে যদি আমার সাংঘাতিক রকমের কোন বিপদও ঘটতো, যদি আমি আহত হতুম বা পঙ্গু হয়ে পড়তুম কিম্বা যদি মারাই যেতুম তবুও এই কাজটা করার চেষ্টা করার জন্যে আমি সুখী। একটা নিরাপদ সুখের জীবনের বিনিময়ে যারা তাদের নিজেদের দেশবাসীদের সর্বনাশ করে, তাদের ওপর নির্যাতন চালায়, সেই সব ঘৃণ্য পা চাঁটা কুকুরদের মত আমি জীবন যাপন করতে পারি না।'

গিয়াপের সারা মুখে নিষ্ঠুরতা জীবন্ত হয়ে উঠল, সে কঠিন স্বরে বললে: 'পা চাঁটা কুকুর, তুমি তাই বললে?'

ত্রোই মাথা নেড়ে সায় দিলে। আমাদের বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটতে লাগল। ওকে ঘিরে জল্লাদগুলো রাগে বুনো জানোয়ারের মত গরগর করতে লাগল। কিন্তু ত্রোইকে তারা বিন্দুমাত্র ভয় পাওয়াতে পারলে না। নির্ভীকতার এ রকম দৃষ্টান্ত আমি এর আগে আর কখনও দেখিনি। আমি একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লুম। ওর সমশ্রেণীর লোক হিসেবে—ওর একজন কমরেড হিসেবে আমার অন্তর গর্বে ভরে গেল। ও অসাধারণ দৃঢ়তার সঙ্গে একদিক থেকে অন্যদিক পর্যন্ত ফিরে ওদের প্রত্যেকের চোখে চোখে তাকিয়ে ওদের প্রতিটি হীন আক্রমণের তীক্ষ্ণ প্রত্যুত্তর দিচ্ছিল।

গিয়াপ বিদ্রূপ করে বললে:

'খুব ভাল কথা। কিন্তু জীবনে আমাদের একদিনও কষ্ট পেতে হয়নি। খাবার দাবার অভাব কাকে বলে তাও জানি না। আমাদের বউ ছেলেমেয়েরাও কত সুখে আছে। তুমি যদি এমনি ধারা কথাবার্তাই চালিয়ে যাও, যদি তোমার কৃতকর্মের জন্যে দুঃখ প্রকাশ না কর, তাহলে কি করে আশা করবে যে তোমার ওপর সদয় ব্যবহার করা হবে।'

ত্রোইর মুখে বিরক্তির ছাপ ফুটে উঠল। সে মাথা ঝাঁকিয়ে উত্তর দিলে, 'তোমাদের মত করে বেঁচে থাকতে আমি পারি না, সত্যি সত্যি পারি না। ঐ রকম করে বেঁচে থাকার চেয়ে আমার কাছে মৃত্যুও অনেকগুণে শ্রেয়। তাম হিয়েট, সেই লম্বা লালমুখো জানোয়ারটা হেসে উঠল, তারপর ত্রোইর ভাঙ্গা পায়ের দিকে দেখিয়ে বললে: মরণের দরজার চৌকাঠে পা দিয়েও তোমার এক গুঁয়েমি গেল না। তাকিয়ে দেখ একবার—ভিয়েৎকংদের কুপরামর্শে কান দেওয়ার ফল হলো তোমার ঐ খোঁড়া পা।'

ত্রোই নিজেকে আর সংযত করে রাখতে পারলে না। একটা পা ভাঙা হওয়া সত্ত্বেও প্রবল উত্তেজনায় দু'টো হাত সামনে ছুঁড়ে দিয়ে সে উঠে দাঁড়াল। কয়েক পা এগিয়ে গেল ও, তারপর দস্যুগুলোর দিকে আদৌ না ফিরে চীৎকার করে বলে উঠল: 'নোংরা আবর্জনা তোমরা, আমি তোমাদের সঙ্গে আর একটাও কথা বলব না।' লোই এতক্ষণ দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসেছিল। পাছে ত্রোই পড়ে যায় এই আশঙ্কায় সে তড়িৎ গতিতে উঠে দাঁড়াল আর এক ছুটে ওর পাশে গিয়ে হাজির হলো। কিন্তু সেই মুহূর্তে আমি ত্রোইর মধ্যে অসাধারণ শক্তির প্রকাশ দেখতে পেলুম। আমাদের দিকে তাকিয়ে সে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রইল। গাড়ী আসার সঙ্গে সঙ্গে বদমাসগুলো ওকে ঠেলে ভিতরে ঢুকিয়ে দিলে, সেইদিন সকালেই ওর আর লোইর বিচার হবে। গাড়ীটা যখন চলে যাচ্ছিল তখন আমরা সকলে উঠে দাঁড়িয়ে ওর উদ্দেশ্যে হাত বাড়িয়ে আমাদের শ্রদ্ধা আর ভালবাসা জানাতে লাগলুম, আর ওর নাম ধরে ডাকতে লাগলুম। গাড়ীতে উঠে দরজাটার কাছেই রয়ে গেল ও, তারপর পিছনে ফিরে ও আমাদের দিকে তাকাল।

সেইদিন এবং তারপর থেকে যখনই আমার অন্যসব বন্দীদের সঙ্গে দেখা হত, তখনই তারা আমাকে সেই অমূল্য দশটি মিনিটের কথা বলতে বলত—যে সময়টা আমি ত্রোইর কাছে থাকতে পেরেছিলুম। আর সেই দিন থেকে যখনই আমাদের মধ্যে কাউকে নির্যাতন করার ঘরে ডেকে নিয়ে যেত বা নির্বাসনে পাঠাত, তখনই

আমরা আপনা থেকে একে অন্যকে বলে উঠতুম, 'এস আমরা ত্রোইয়ের মত সাহসী হই, তার মত করে বাঁচি।'

'দিনের পর দিন সায়গণের পথে ঘটনাবলী জোর কদমে এগিয়ে যেতে লাগল। দিনের তো কথাই নেই এমনকি রাত্রেও বিক্ষোভ মিছিল বেরোতে লাগল। আমার বাপের বাড়ীর কাছাকাছি যারা বাস করত—যেমন ঘর-বাড়ীতে রং লাগানো কর্মীরা, জাহাজের খালাসীরা, ছ্যাকরা গাড়ীর চালকরা, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র এবং চিনি শোধনাগারের শ্রমিকরা—তারা সবাই কাজ বন্ধ করে প্রতীকযুক্ত ঝাণ্ডা কাঁধে নিয়ে মিছিল করে খানের সদর দপ্তরে গিয়ে তার পদত্যাগ দাবী করতে লাগল। নুয়েন খান * আমার স্বামীর মৃত্যু দণ্ডাদেশে স্বাক্ষর করেছিল, এখন সমগ্র জনসাধারণ তাকে ধিক্কার দিতে লাগল, তার শাপান্ত করতে লাগল। আমি যখন জেলখানায় ছিলুম, তখন সেখানেই আমাদের কমরেডদের বলতে শুনতুম যে সায়গনের কুড়ি লক্ষ লোক যদি পুতুল সরকার আর তার পেটোয়াদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করত আর যদি সেই আক্রমণের সঙ্গে বাইরের থেকে আক্রমণের সংযোগ-সাধন করা যেত, তা হলে দু'দিনেই শত্রুরা খতম হয়ে যেত। আমার স্নায়ুতন্ত্রী ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল। আর এই চিন্তাটাই কেবল আমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল: যদি সায়গনের জনসাধারণ অভ্যুত্থান করে আমি আগে ছুটে যাব জেলখানায়, আর আমার স্বামীকে মুক্ত করবার জন্যে একটা করে ইঁট খসিয়ে জেলখানাটাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে সাহায্য করব। কিন্তু কোন্ জেলখানায় এখন তাকে আটকে রেখেছে? ১৭ই আগস্ট, যেদিন খুনেগুলো ওকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করল, সেই দিন থেকেই আমি খুঁজে বার করার চেষ্টা করছি কোথায় ওকে আটকে রেখেছে।

উৎকণ্ঠায় আমি পাগলের মত হয়ে গিয়েছিলুম। সে কি এখনও চি হোয়া জেলখানায় আছে? ওর খোঁজে আমাকে যখন এক জেলখানা থেকে আর এক জেলখানায় বোকার মত ঘুরিয়ে মারছে, তার মধ্যেই হয়তো তাকে খুন করে ফেলেছে। আমি মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত বন্দীদের ওয়ার্ডে খোঁজ নিতে গেলুম।

সেখানে আমি একটা প্রহরীর কাছ থেকে উত্তর পাবার আশায় অপেক্ষা করছিলুম, এমন সময় একটা গলা শুনতে পেলুম, আমাকে ডাকছে, 'কুয়েন!' 'কুয়েন!'

* জেনারেল নুয়েন খান তখন সায়গনের পুতুল সরকারের প্রধান

এই তো আমার স্বামী! আমি অফিসঘর থেকে ছুটে বাইরে যেতে না যেতেই একটা জেলখানার গাড়ী ছুটে বেরিয়ে গেল। তার মধ্যে রয়েছে ত্রোই, তারের জাল দেওয়া একটা ছোট জনালার ওপর মুখ গুঁজে বাইরে তাকিয়ে আছে। সে আমাকে ডাকতে লাগল আর হাত বাড়াতে লাগল।

আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে আমি গাড়ীটার পিছনে পিছনে দৌড়তে লাগলুম, আর আর্তকণ্ঠে চীৎকার করতে লাগলুম, 'ওরা ওকে খুন করার জন্যে নিয়ে যাচ্ছে। আমার—আমার স্বামীকে বাঁচাও, বাঁচাও।' রাস্তার মোড় ঘুরে ধুলোর মেঘের মধ্যে দাঁড়িয়ে সাহায্যের আশায় চারপাশে, পাগলের মত তাকাতে লাগলুম, আর 'ত্রোই! ত্রোই!' বলে আর্তকণ্ঠে চীৎকার করতে লাগলুম। তখন একটা প্রহরী ছোট একটা জানালার মধ্যে দিয়ে মাথা গলিয়ে ধমক দিয়ে বলে উঠল, 'অযথা এত হৈ-চৈ করছ কেন? ওরা তোমার স্বামীকে ছবি তোলার জন্যে নিয়ে গেছে। আজ বিকেলেই আবার ও এখানে ফিরে আসবে। আমি তোমাকে একটা পাস দেব। তিনটের সময় আবার এস, তখন তুমি ওকে দেখতে পাবে।'

ওর কথা বিশ্বাস করতে না পেরে আমি ব্যগ্রকণ্ঠে জিগ্যেস করলুম. 'তোমার কথা সত্যি? সত্যি বলছ তুমি?

'নিশ্চয়ই! এই দেখ তোমার পাস।'

তখনি কেবল আমি আশ্বস্ত হলুম। তিনটের সময় আমি ফিরে এলুম। মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত বন্দীদেরর জন্যে নির্দিষ্ট দেখা সাক্ষাৎ করবার ঘরে ত্রোই আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। হাতের ওপর মাথা রেখে ও একটা বেঞ্চের ওপর শুয়েছিল। ওর পাশে ছিল ওর এক সহবন্দী। সে ওকে ধরে ধরে চারতলা থেকে নামিয়ে এনেছিল। কয়েক গজ দূরে একটা পুলিশ ছোট একটা টেবিলের সামনে বসে-ছিল। আমাকে ঢুকতে দেখে ত্রোইর বন্ধু উঠে সেখান থেকে চলে গেল। ত্রোই আমার দিকে তাকাল, তারপর উঠে বসল। ওর পরণে একটা সাদা শার্ট আর একটা ডোরাকাটা হ্যাফপ্যান্ট। আমি যে খাবারের চুপড়িটা নিয়ে গিয়েছিলুম, সেটা আরও শক্ত করে চেপে ধরলুম, কিছুতেই যেন এটা আমার হাত থেকে পড়ে না যায়। আমার জেলখানার সঙ্গিনীদের কথাটা আমার মনে পড়ল: 'সব সময় মাথা উঁচু করে রাখবে। যাই ঘটুক না কেন, কখনও কাঁদবে না। তোমাকে কাঁদতে দেখলে প্রিয়জনেরা আরও বেশী কষ্ট পাবে।' ত্রোইর জীবনের আর অল্প যে ক'টা দিন বাকী ছিল

সেই ক'দিন আর আমি তাকে আমার জন্যে উৎকণ্ঠিত হতে দিতে চাইনি। কিন্তু চোখের জলকে বাঁধ মানাতে পারলুম না; দু'গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে আমার ঠোঁট দু'টোকে লোনা স্বাদে ভরিয়ে দিল। আমি ওর নাম ধরে ডেকে উঠতে চাইলুম, কিন্তু আমার গলা দিয়ে স্বর বেরুল না। কান্নায় ভেঙে পড়ার হাত থেকে নিজেকে সমালাবার জন্যে আমি শক্ত করে ঠোঁট কামড়ে ধরলুম, আর আস্তে আস্তে ওর কাছে গিয়ে হাজির হলুম। ও দু'-হাত বাড়িয়ে আমার হাত দু'টো শক্ত করে চেপে ধরল, আর আমাকে কাছে টেনে নিয়ে তার পাশে বেঞ্চির ওপর বসাল। আমি ওর কাঁধের ওপর আমার মাথাটা রাখলুম। আমার দুঃখের ভার আমি বইতে পারছিলুম না। আমি কথা বলতে চাইলুম, ওর নামটাও উচ্চারণ করতে পারলুম না। আমি ওকে জড়িয়ে ধরে চোখের জলে বুক ভাসাতে লাগলুম।

ও কিছুক্ষণ ধরে গভীর স্নেহে আমার চুলে হাত বুলোতে লাগল, তারপর বলল : 'খবরটা প্রথম যখন তুমি পড়লে, তখন নিশ্চয়ই প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলে।' কান্নায় আমার গলা বুজে আসছিল, তার মধ্যে আমি উত্তর দিলুম : 'আমি আর কি বলব? বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজনরা এসেছিল খবরটা আমার কাছে অল্প অল্প করে ভাঙবে বলে, তা তারা নিজেরাই কেঁদেকেটে সারা। দিনের পর দিন আমি চেষ্টা করেছি ওরা তোমাকে কোন্ জেলখানায় আটকে রেখেছে সেটা খুঁজে বের করতে। বাবা দণ্ডদান স্থগিত রাখার দাবী করার জন্যে একজন উকিল লাগিয়েছেন।'

কথাটা শুনে ত্রোই খুশী হলো না বলে মনে হলো। ও বললে : 'উকিল লাগিও না, শুধু শুধু পয়সা নষ্ট।'

তারপর আমার চোখের জল মুছিয়ে দিতে দিতে বললে : 'আমার সঙ্গে পরিচয় হয়ে তোমাকে অনেক দুঃখ কষ্ট সইতে হচ্ছে, এর জন্যে কি আমার ওপর তোমার রাগ হয়, কুয়েন?'

'আমি তোমাকে ভালবাসি, ত্রোই। কি করে আমি কোন কিছুর জন্যে তোমার ওপর রাগ করব? সময় সময় আমি তোমাকে বুঝেছি, কিন্তু জেল-খানায় থাকার সময় আমার কমরেডরা আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে, আমার ভুলভ্রান্তিগুলো ধরিয়ে দিয়েছে। কি লজ্জাই না আমি তখন পেয়েছিলুম। তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, আমার কোন ধারণাই ছিল না যে তুমি বিপ্লবী কাজকর্মে জড়িয়ে আছ। সেইজন্যে আমি প্রায়ই তোমাকে সন্দেহ করতুম। আর এমনি করে আমি তোমার কাজকর্মকে আরও বেশী কষ্টসাধ্য করে তুলেছিলুম।'

ও বললে, 'আমার ওপর যে কাজের ভার পড়েছিল সেই ব্যাপারে সবরকম ব্যবস্থাপত্তর করার জন্যে আমি আমাদের বিয়ের—ঠিক আগে ভয়ানক রকমের ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলুম। আমাকে দিন-রাত্তির বাইরে কাটাতে হত। এই ধরণের কাজকর্মে, নিয়ম হলো সবকিছু একান্তভাবে গোপন রাখা। সেইজন্যই আমাকে তোমার কাছে মিথ্যে কথা বলতে হয়েছে। আর এর থেকেই তোমার সন্দেহ হয়েছিল যে আমি তোমার প্রতি বিশ্বাস ভঙ্গ করছি। আমি সবই বুঝতুম আর তোমার জন্যে খুব দুঃখ হত।'

'আমি তোমাকে কথা দিয়েছিলুম যে বিয়ের পরে দু'জনে মিলে একসঙ্গে বেড়াতে বেরোব। কিন্তু বিয়ের পর থেকে আজ পর্যন্ত এই সামান্য বেড়াতে বেরোনটাও আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি. আমি জানি কুয়েন, তোমার সঙ্গে যেমন আচরণ করা উচিত ছিল তা আমি করতে পারিনি, কিন্তু আমার অন্য কিছু করার কোনও উপায় ছিল না। কখন কখন আমি তোমার প্রশ্নের অত্যন্ত আজগুবি উত্তর দিয়েছি। এমনকি আমাদের বিয়ের ঠিক পর থেকেই আমি প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলাতেই বেরিয়ে গেছি আর বাড়ী ফিরেছি অনেক রাত করে। আমাকে নানা জনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে হত, তাছাড়া আমাকে শত্রুর গতি-বিধির ওপর নজর রাখতে হত, যাতে আমি ঠিক জায়গায় আমার যন্ত্রপাতি বসাতে পারি। স্বামী হিসেবে আমি একটা অপদার্থের মত আচরণ করেছিলুম। যখন তোমার মেজাজ খুব বিগড়ে যেত আমি এই বলে ব্যাপারটা শেষ করে দিতুম যে আমি খুবই ব্যস্ত বা কাজের চাঁপে নিঃশ্বাস ফেলার পর্যন্ত সময় পাচ্ছি না। আমিই যদি তুমি হতুম তো আমিও সন্দেহ করতুম। এতসব সত্ত্বেও তুমি বরাবর একজন একনিষ্ঠ স্ত্রীর মতই আচরণ করেছ, অন্যকোন মেয়ে হলে এতটা সহ্য করত না। আমি বুঝতুম যে তুমি খুবই কষ্ট পাচ্ছ। কিন্তু আমি তোমাকে সব বুঝিয়ে বলতে পারতুম না। আমি কেবল ভাবতুম যে আমার ওপর যে কাজের ভারটা পড়েছে সেটা আগে মিটে যাক, তারপরেই আমি তোমাকে সব বুঝিয়ে বলব। কিন্তু এখন তো তুমি সবই বুঝতে পারছ, তাই না?'

'যে মুহূর্তে ওরা তোমাকে হাতে হাতকড়া-লাগিয়ে বাড়ীতে এনে হাজির করল সেই মুহূর্তেই আমি সবকিছু বুঝতে পেরেছিলুম।'

'আমি তোমাকে বহুবার বলেছি যে আমি মিথ্যেবাদী আর ঠকবাজদের ঘৃণা করি। আমি তোমাকে এও বলেছি যে অতি সামান্য কোন ব্যাপারেও কারো মিথ্যে কথা বলা উচিত নয়। তা সত্ত্বেও আমি তোমার সঙ্গে ছলনা করেছি। কিন্তু

এর জন্যে আমি মোটেই লজ্জিত নই, কারণ সবই আমি বিপ্লবের জন্যে করেছি। ভবিষ্যতে যদি তোমাকে সায়গনের মত কোন শহরে বিপ্লবী দায়িত্ব পালন করতে হয়—যেখানে পুলিশ আর গুপ্তচরেরা সব গিজগিজ করছে—তাহলে তোমার কার্য-কলাপ সব গোপন রাখবার জন্যে তোমাকেও নানা গল্প বানিয়ে বলতে হতে পারে।'

আমি একটা কমলালেবু বের করে ত্রোইর জন্যে ছাড়াতে শুরু করলুম, কিন্তু ও আমায় থামিয়ে দিলে, 'এখন রেখে দাও, পরে খাব'খন। এখন আমাদের হাতে সময় খুবই কম, আর কথা রয়েছে অনেক, যা তোমাকে বলা একান্তই দরকার। খুনেরা যখন আমাকে সাধারণ পুলিশ বিভাগের সেলে ফিরিয়ে আনলে, তখন অন্যান্য বন্দীদের তুমি যা বলতে বলেছিলে তারা আমাকে সবই বলেছিল। ওরা আমাকে বলেছিল যে তোমার অনেক উন্নতি হয়েছে, তুমি ওদের উপদেশ মন দিয়ে শুনেছ আর অনেক কিছুই বুঝতে শুরু করেছ।' কথাগুলো আমার কানে সুরের ঝংকারের মত লাগছিল। 'আমি এখনও জেলখানা থেকে পালাবার আশা রাখি, কিন্তু শত্রু যে কোন মুহূর্তে যা কিছু করতে পারে। আর যদি সবচেয়ে খারাপটাই ঘটে যায়, তাহলেও আশা করি তুমি আমাদের বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজকর্ম চালিয়ে যাবে।'

ও সংকেতে কথা বলছিল, কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পারছিলুম ও কি বলতে চাইছে আর সাংঘাতিক ব্যাপারটা কি ঘটতে পারে। ও একটা রুমাল বের করে আমার চোখের জল মুছিয়ে দিলে। তারপর যখন ও ফিসফিস করে আমার কানে কানে কথা বলতে লাগল তখন ওর গলাও কাঁপতে লাগল। ও বললে:

'তোমাকে যাতে একা পড়ে থাকতে না হয়, আমার কমরেডরা সেদিকে লক্ষ্য রাখবে। জেলখানায় থাকার সময় তুমি নিশ্চয়ই তা দেখেছ। আর আমিই একা নই—হাজার হাজার আমার চেয়ে বয়স্ক কমরেডরা শত নিষ্ঠুরতা, শত অত্যাচার সত্ত্বেও বিপ্লবের প্রতি বিশ্বস্ত রয়েছেন। পথে ঘাটে তুমি যে জনতাকে দেখতে পাও তারা শুধু তাদের প্রতিদিনের একমুঠো ভাতের জন্যেই খেটে মরছে না, তারা বিপ্লবেও অংশগ্রহণ করছে—প্রত্যেকেই তার নিজের নিজের কর্তব্য পালন করে চলেছে। অনেকেই তাদের স্বামী, ছেলে বা ভাইকে হারিয়েছে। তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে চল, আর তোমারও কিছু কিছু বিপ্লবী কাজকর্ম করা উচিত—তা যদি কেবলমাত্র প্রচারপত্র বিলি করা বা কোন সুসংবাদ ছড়িয়ে দেওয়ার মত সামান্য কাজও হয়, তবুও তাই নিষ্ঠা সহকারে সম্পাদন করতে হবে।'

'কিন্তু আমার ভয় হয় যে ওরা আমাকে বিশ্বাস করবে না', আমি ওকে বললুম,

'বিপ্লবী কাজকর্ম করতে আমার খুবই ইচ্ছে করে। আর এখন তুমি গ্রেপ্তার হয়েছ বলে আমি আরও বেশী করে চাই আমার জেলখানার কমরেডদের মত সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করতে।'

এরপর ও অন্য একটা বিষয়ে কথা শুরু করলে, বললে যে বিষয়টা ওকে খুব ভাবিয়ে তুলেছে।

ও জিগ্যেস করলে: 'কথাটা সত্যি নাকি যে ওরা উত্তরে বোমা ফেলেছে?'

'হ্যাঁ, সত্যি।'

'কতবার?'

'মাত্র একবার।' *

'আমাদের লোকেরা কি কোন উড়োজাহাজ গুলি করে নামিয়েছে?'

'চারটে আমেরিকান জাহাজ।'

'আমাদের কি কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে?'

'খুব বেশী নয়। সমুদ্রের ধারের কয়েকটা গ্রামে কেবল বোমা পড়েছে।'

ও তারিফ করার ভঙ্গিতে বেশ কয়েকবার মাথা নাড়ল, খবরটা শুনে ও খুব খুশী হয়েছে বলে মনে হলো।

'উত্তরকে যদি ওরা আক্রমণ করে তা হলে নিজেদের কবরের দিকেই ওরা তাড়াতাড়ি ছুটে যাবে। ওরা যদি আবার আক্রমণ করে, তাহলে খুব মন দিয়ে সব খবর শুনবে আর যদি তোমাকে আবার আমার সঙ্গে দেখা করতে দেয় তা হলে আমাকে সে সব বলবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।'

তারপর ও আমাদের বন্ধুবান্ধবদের কথা জিগ্যেস করলে, তারপর বললে: 'আমাদের আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে যখন দেখা সাক্ষাৎ হবে, তখন আমার হয়ে ক্ষমা চেয়ে নিও। তাঁরা সব আমাদের বিয়ের সময় এসেছিলেন কিন্তু আমি ওঁদের সঙ্গে দেখা করতে যাইনি। মা খুব কান্নাকাটি করছেন, তাই না?'

প্রহরীটা আমাদের কথা বার্তায় বাধা দিল----বললে, 'সময় শেষ হয়ে গেছে।' আমি ওকে ধরে ধরে আস্তে আস্তে দাঁড় করিয়ে দিলুল, তারপর ওকে বুকে টেনে নিলুম। আমার কেমন যেন মনে হলো আমি ওকে আর দেখতে পাব না। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে ওকে শেষ প্রশ্ন করলুম: 'তোমার সঙ্গে কি আমার আবার দেখা হবে?'

* তখন ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাস। উত্তর ভিয়েতনামে প্রথম বিমান আক্রমণ হয় ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের ৫ই আগষ্ট।

ও আমাকে দু'হাতে বুকে টেনে নিয়ে চুমু খেল, আমার চোখের জলে ওর গাল দু'টো ভিজে গেল।

ও তার সন্ধানী দৃষ্টি জোড়া ফেললে আমার মুখের ওপর আর তারপর বললে :

'আবার আমাদের দেখা হবে। বিশ্বাস কর।'

আমি ওর দু'কাঁধ শক্ত করে আঁকড়ে ধরে ছিলুম; ও আস্তে আস্তে আমার মাথাটা সরিয়ে দিয়ে আমার চুলে হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগলো। তারপর বললে : 'তোমার জেলখানার বন্দীদের মত করে বাঁচার চেষ্টা করো। দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে শেখো। সবসময় বুকে সাহস রেখো।'

আমি ওকে ধরে ধরে ঘরের অপর প্রান্ত পর্যন্ত নিয়ে গেলুম। সেখান থেকে আর একজন বন্দী ওকে ধরে সিঁড়ির দিকে নিয়ে গেল। যতক্ষণ না ওরা দু'জনে একটা বাঁকের মুখে অদৃশ্য হয়ে গেল ততক্ষণ আমি ওদের দিকে তাকিয়ে রইলুম, তারপর চলে এলুম।

৩০ শে আগষ্টের জন্যে আমি আর অপেক্ষা করে থাকতে পারছিলুম না! সেই দিন আবার ওর সঙ্গে আমার দেখা হবার কথা। এটাই কি শেষ দেখা হবে? ওর জন্যে আমি সব রকমের জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখে দিয়েছিলুম। আমি ওর জামা কাপড়ে আর একটা থলিতে সুতো দিয়ে ওর আর আমার নাম লিখছিলুম, আর প্লাসটিকের একজোড়া খাবার কাঠি আর একটা কাপেও আমাদের দু'জনের নাম খোদাই করেছিলুম। আমার জেলখানার সঙ্গিনীরা আমাকে যে সব গান শিখিয়েছিল, তার সবগুলোই আমার মনে ছিল। যেটা সবচেয়ে ভালবাসতুম, সূঁচ সুতো দিয়ে সেইটা আমি লিখলুম একটা রুমালে। এটা করতে আমার বেশ কয়েক রাত্তির লেগে গেল, কারণ প্রত্যেকটা ফোঁড়ই খুব সাবধানে তুলতে হত। ত্রোই কি অবাকই না হয়ে যাবে : ও কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারবে না যে আমি নিজে নিজেই এটা করেছি। সূঁচ সুতো দিয়ে লেখাটা যখন শেষ হয়ে গেল তখন আমি কাপড়ের টুকরোটা আমার বাপের বাড়ী নিয়ে গেলুম। সেখানে আমি আমার মা'র সেলাইকলে ধারটা মুড়ে সেলাই করে নিলুম। আমার বোন আমার বাবাকে পড়ে শোনাল :

ওঠে উঠুক জলদি ফুঁসে,

ছোটে ছুটুক বাতাস বেগে

ভীম ভৈরব প্রবল ঝঞ্ঝা মাতুক না তাণ্ডবে।

তবু তারি মাঝে আমার এ হিয়া তোমা পথ চেয়ে রবে॥

পথ ছেয়ে আছে শঙ্কা বিপদ যত,
সে সবার মাঝে মৃত্যুঞ্জয় থাক তুমি অনাহত।
যশের মুকুট মাথায় পরে
তুমি এস বীর ঘরে ফিরে
যাবে মোদের মাতৃভূমি
ওগো, আবার মিলিত হবে।

'হায় ভগবান, আমার বাবা চেঁচিয়ে উঠলেন। 'এমনিতেই তোর জ্বালা যন্ত্রণার অন্ত নেই, তার ওপর যদি পুলিশ তোকে ঐটা শুদ্ধ ধরে ফেলে, তা হলে ওরা তোকে পিটিয়েই মেরে ফেলবে।'

'কিছু ভেবোনা, আমি ধরা পড়ব না।'

৩০ শে আগস্টের সকালবেলা, আমি চি হোয়া জেলখানায় হাজির হলুম। কিন্তু জেলখানার অফিসে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারটা আমার মুখের ওপর অঙুল নেড়ে বলে উঠল : 'ওপর ওয়ালার হুকুম হয়েছে যে তুমি আর কখনও সুয়েন ভ্যান ত্রোইর সঙ্গে দেখা করতে পারবে না। গেলবার তুমি যখন দেখা করতে এসেছিলে তখন তুমি ওকে কি সব বলেছিলে যার ফলে পরে ও অত গোলমাল পাকিয়ে তুলেছিল?'

'আমি তো শুধু ওর শরীর গতিক কেমন আছে তাই জিগ্যেস করেছিলুম, আর পারিবারিক ব্যাপার স্যাপার নিয়ে কিছু কথা-বার্তা বলেছিলুম। আমি তো ওকে আর কিছু বলিনি।'

'যাই হোক তুমি ওর সঙ্গে দেখা করতে পারবে না'—লোকটা কেটে জবাব দিলে। 'এটা আমার ওপর ওয়ালাদের হুকুম।'

আমি অনেক করে বললুম কিন্তু কিছু হলো না। এমনকি আমি আমার স্বামীর জন্যে যে ফল আর খাবার নিয়ে গিয়েছিলুম সেগুলোও সে ওকে নিয়ে গিয়ে দিতে রাজী হলো না। জেলখানার ফটকের কাছে শ্রীমতী 'ম'-এর সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল। আমাকে দেখেই তার চোখের জলের ধারা নামল।

'তোমার স্বামীর মৃত্যুদণ্ড হয়েছে, তাই না?' তিনি জিগ্যেস করলেন।

'হ্যাঁ'

'তুমি ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছ?

'হ্যাঁ, কিন্তু ওরা আমাকে দেখা করতে দেবে না।'

এই কথা শুনে তিনি ফল আর খাবারটা আমার স্বামীর কাছে পাঠিয়ে দেবার

একটা ব্যবস্থা করবেন বললেন, আর পরের বার ত্রোইর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে পাস পেতে হলে কি করতে হবে না-হবে সে পরামর্শও দিয়ে দিলেন। আমার খুব ভাগ্য ভাল যে- তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল। তাঁর মেয়েকে অল্প কয়েকদিন হলো চো কুয়ান হাসপাতাল থেকে চি হোয়া জেলখানায় পাঠান হয়েছে। বহু বছর ধরে তিনি তাঁর মেয়ের পিছু পিছু এক জেলখানা থেকে আর এক জেলখানায় ঘুরেছেন আর তার দেখাশোনা করেছেন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে শ্রীমতি 'ম' বেশ কয়েকজন পুলিশের লোকের সঙ্গে চেনা-পরিচয় করে নিয়েছিলেন, আর তাদের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করতে হয় শিখে গিয়েছিলেন।

এরপর একটা একটা করে অনেকগুলো দিন উৎকণ্ঠার মধ্যে কেটে গেল। অবশেষে সেপ্টেম্বরের ১৮ তারিখে আমাকে চি হোয়া জেলখানায় আসতে বলা হলো। সেখানে আমাকে একখানা পাস দেওয়া হবে আর কবে আমি আমার স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে পাব সেটা বলে দেওয়া হবে। কিন্তু আমি যখন সেখানে হাজির হলুম তখন ভারপ্রাপ্ত পুলিশটা বললে যে আমি সেই দিন বিকেলেই ওর সঙ্গে দেখা করতে পারি। লোকটা আরও বললে: 'তোমার স্বামী ক্যাথলিক হয়ে গেছে। ধর্মযাজক তাকে দীক্ষা দিয়েছেন।'

আমি এক দৌড়ে জেলখানার ফটক পার হয়ে বাইরে চলে এলুম আর হাতের কাছে খাবার দাবার বিশেষ করে ফলটল যা কিছু পেলুম তাই কিনে ফেললুম। ত্রোই ধূমপান করত না আর চা-ও খেত না, কিন্তু ও ফলমূলের খুব ভক্ত ছিল। দু'হাত ভর্তি ঠোঙা নিয়ে আমি আবার ছুটে গেলুম দর্শনপ্রার্থীদের ঘরে, তারপর একেবারে আমার স্বামীর কাছে গিয়ে হাজির হলুম। 'তুমি আমার জন্যে অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করে আছ, তাই না?' আমার ঘামে ভেজা কপাল আর গালের ওপর কয়েক গোছা চুল লেপ্টে ছিল। ধীরে ধীরে পরম স্নেহ ভরে সেগুলোকে পেছনে সরিয়ে দিতে দিতে ও আমাকে বললে: 'তা, কিছুক্ষণ হবে। তুমি হাঁপিয়ে গেছ কেন?' 'আমি ভাবতে পারিনি যে ওরা আমাকে আজই তোমার সঙ্গে দেখা করতে দেবে। তাই আমি তোমার কাপড় বা থলেটা কিছুই নিয়ে আসিনি। আমি আজই এইমাত্র দেখা করার পাস পেলুম। সাধারণত ওরা পাস দেবার দু'দিনের আগে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারি না; কিন্তু আজকে ওরা বললে যে কিছুদিনের মধ্যেই এখানে একটা বিশেষ ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে, তাই আমি যদি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই তা হলে আজকেই দেখা করে নেওয়া ভাল। তাই তোমার জন্যে কিছু ফল কিনে আনব বলে ছুটতে ছুটতে বাইরে গিয়েছিলুম,

আবার কেনা কাটা সেরে ছুটতে ছুটতে ফিরে এসেছি, যাতে অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করে বসে থাকতে না হয়।'

আমার হাতের মোড়কগুলোর দিকে এক ঝলক তাকিয়ে ও বললে: 'তুমি শুধু একগাদা টাকা পয়সা খরচ করছ। ঐ সব জিনিসে আমার কোন প্রয়োজন নেই। আমাদের বিয়ের খরচপত্রের জন্যে যে ধার হয়েছিল সেসব মেটাবার জন্যে বরং তোমার এইসব টাকা জমান উচিত।'

'ধারদেনার জন্যে তুমি ভেবো না, সে সব আমি সামলাতে পারব। আচ্ছা, তুমি ক্যাথলিক হয়েছ, একথা সত্যি? ওরা বললে যে তুমি ধর্মান্তর গ্রহণ করেছ।'

'কে বললে একথা?' ও অবাক হয়ে জিগ্যেস করলে।

'জেলখানার অফিসে যে লোকটা রয়েছে সেই লোকটা।'

'ওটা একটা মিথ্যে কথা, আমি কখনই তা করব না। কয়েকজন যাজক এসে আমাকে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আমি প্রত্যাখ্যান করেছি। ওদের একটা কথাও বিশ্বাস করো না। শয়তানরা বাইরের কমরেডদের এই বিশ্বাসটা ঢুকিয়ে দিতে চায় যে আমি আস্তে আস্তে অন্য পক্ষে ভিড়ে যাচ্ছি, তাই ওরা এইসব মিথ্যে গুজব রটাচ্ছে।'

'তোমার ব্যাণ্ডেজ খুললো কবে?' ওর পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে জিগ্যেস করলুম।

'১৫ তারিখে। মা বাবা কেমন আছেন?'

'তাঁরা ভালই আছেন। ছোট্ট ক্যান খালি তোমাকে দেখতে আসবে, দেখতে আসবে বলে। ইচ্ছে করে ছোট্ট ড্যানকেও আমার সঙ্গে নিয়ে আসি, কিন্তু পুলিশ আমার ওপর এমন কড়া নজর রেখেছে যে ভয় হয়----তাতে ওদের পরিবারটাও বিপদে পড়ে যাবে।'

'হাসপাতালে আমাকে দেখার পর ক্যান কি বললে?'

'ও গর্ব করে বলে বেড়াত 'আমি বড়দাদা তু'কে দেখেছি, ও দু'টো লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটছিল আর আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসছিল।'

'বাচ্ছাটাকে আমি খুব ভালবাসি। ও আমার দিকে হাত নাড়িয়ে ডেকে উঠেছিল 'বড়দাদা'! কি দুঃখের কথা যে আমি আরও কাছে এসে ওকে দেখতে পারলুম না। ছুটে বাইরে এসে ওকে বুকে চেপে ধরতে পারলে আমার প্রাণটা ঠাণ্ডা হত। এই মাসের শেষের দিকে তুমি হয়তো আবার আমার সঙ্গে দেখা

করতে পারবে। সেই সময় ওকে সঙ্গে আনতে ভুলো না। ছোট্ট ড্যানের জন্যে কিছু মিষ্টিটিষ্টি কিনে নিয়ে যেও। ওকে বোলো ত্রোই কাকু ওর জন্যে এগুলো পাঠিয়েছে। আমি ওর বয়সে যেমনটি ছিলুম ও-ও হয়েছে ঠিক তেমনি, একটুখানি স্নেহের জন্যে কাঙাল। আমার হয়ে তুমি ওর দেখাশোনা কোরো, কেমন ?'

আমি গলা নামিয়ে ফিসফিস করে ওকে বললুম, 'গেল বার আমি দেখা করে যাবার পর তুমি কি কাণ্ড শুরু করেছিল ? ওরা বললে, তুমি নানা গোলমাল পাকিয়ে তুলেছিলে। আর সেই জন্যে আমাকে আর দেখা করতে দিচ্ছিল না।'

'আমি অন্যান্য বন্দীদের আনন্দ দেবার জন্যে শুভ সংবাদটা তাদেরও শুনিয়েছিলুম। আমি ওদের বলেছিলুম, আমেরিকানরা উত্তর ভিয়েত্‌নামের উপর বোমা ফেলেছে, কিন্তু ক্ষয়ক্ষতি বেশী কিছু করতে পারেনি, বরং তাদেরই অনেক গুলো বিমান ধ্বংস হয়েছে। সমস্ত কমরেডরা আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। তোমার দেওয়া খবরটা গুণ্ডাদের সমস্ত মিথ্যে প্রচার ফাঁস করে দিয়েছে।'

'৩০ তারিখে আমি যখন তোমাকে দেখতে এলুম না তখন তুমি খুব নিরাশ হয়েছিলে, তাই না ? শ্রীমতী 'ম' যিনি একজনকে ধরে টরে তোমার কাছে খাবারের ঠোঙাগুলো পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি আমাকে বলেছিলেন যে তুমি সেদিন খুব চঞ্চল হয়ে পড়েছিলে----এক মুহূর্তের জন্যেও স্থির হয়ে থাকতে পারছিলে না।'

ত্রোই হেসে উঠল।

'প্রহরী এসে কখন আমায় দর্শন প্রার্থীদের ঘরে ডেকে নিয়ে যাবে, সারা বিকেল তার অপেক্ষায় বসে থেকে থেকে আমার সারা শরীরে ঝিন্‌ঝিনি ধরে গিয়েছিল। তোমাকে দেখার জন্য আমার প্রাণ আকুল হয়ে উঠেছিল। তোমার একটা ফটো আমার কাছে ছিল, কিন্তু ওরা সেটা খুঁজে পেয়ে ছিঁড়ে ফেলেছিল। যখন সন্ধ্যে হয়ে গেল অথচ তবুও তুমি এলে না, তখন আমি খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লুম। কারণ তুমি অসুস্থ হয়ে পড়েছ, না তোমাকে গ্রেপ্তার করেছে---তার কিছুই আমি জানতে পারছিলুম না।'

প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত বন্দীদের ব্লক থেকে নেমে এসে একজন মহিলা বন্দী বেঞ্চটার অন্তপ্রান্তে তার মা'র পাশে গিয়ে বসলেন। তাঁর মা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন, কান্নায় তাঁর কথা কেটে কেটে যাচ্ছিল। তাঁর কথায় হুয়ে অঞ্চলের টান।

কোয়াংনাম থেকে ত্রোইর যে আত্মীয়-স্বজন এসেছিলেন, তাঁদের কথা ওকে বললুম। তারা ওর সঙ্গে দেখা করবার অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পারেননি।

"ওঁরা কি এখনও এখানে আছেন ?' ও জিগ্যেস করলে।

'না, তাঁরা ফিরে গেছেন।'

'ওঁদের একটা চিঠি লিখে জানিয়ে দিও যে আমি ভালই আছি, আর হ্যাঁ, কে দাদা কোথায় ? তিনি কি ছাড়া পেয়েছেন ?'

'হ্যাঁ পেয়েছেন' ?

আক্ষেপের সুরে ও বললে :

'ওঁকে আমার নমস্কার জানিও। আমরা একই বাড়ীতে থাকতুত কেবলমাত্র এই জন্যেই ওঁকে গ্রেপ্তার করল। ওঁকে ভাবনা করতে বারণ কোরো আর বোলো যে ওঁকে বাড়ী বিক্রি করে অন্য জায়গায় উঠে যেতে হবে না। উনি যদি বাড়ীটা বিক্রি করে দেন তা হলে তুমি কোথায় থাকবে ?' একটা পুলিশ এসে একটা কাগজ দিল আমার হাতে। সঙ্গে লাগান ফটোটার দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলে :

'কবে তুলিয়েছ ওটা ?'

'অল্প কয়েকদিন হলো। বন্দীদের সঙ্গে দেখা করবার আবেদন পত্রের সঙ্গে সঙ্গে ফটোও দিতে হচ্ছে।'

'ফটোতে তোমাকে খুব রোগা আর ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে।'

ও আমার দিকে উদ্বেগের দৃষ্টিতে তাকাল।

'তোমাকে খুব ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে কেন বলতো ?

'আমি তো ভালই আছি।'

'আমাদের পড়শীরা এখনও তোমাকে ওদের ওখানে চান করতে দেয় তো ?

'হ্যাঁ, ওঁরা আমার সঙ্গে সব সময়েই ভাল ব্যবহার করেন।'

ও আমাকে সিঁড়িগুলোর কথা মনে করিয়ে দিলে :

'ওগুলো উঁচু উঁচু। এক এক বারে আধবালতির বেশী জল নিয়ে যেও না। তাহলে আর তোমার পড়ে যাবার ভয় থাকবে না।'

'এই রকম সব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামিও না তো। আমি এখন আগের থেকে অনেক বদলে গেছি। বেশ শক্ত সমর্থ হয়েছি এখন আর আমি একা উঠোনে যেতে একটুও ভয় পাই না।'

প্রসঙ্গটা বদলে ও জিগ্যেস করলে :

'শহরের মধ্যেকার ভাবগতিক কেমন ?'

'শাসন কর্তৃপক্ষ কিছু কিছু সুযোগ সুবিধা দিয়েছে, তাই এখন আর তত বেশী বেশী বিক্ষোভ-মিছিল বোরোয় না। যেদিন 'আকস্মিক ভাবে বলপূর্বক শাসন ক্ষমতা হাত বদল' (coup) হলো সেদিন রাত্তিরে আমি এক নিমিষের জন্যেও ঘুমোইনি, গুলি গোলার আওয়াজ শোনার অপেক্ষায় জেগে বসেছিলুম। কিন্তু যখন সকাল হলো আর স্বাবাবিক অবস্থা ফিরে এল, আমি খুব নিরাশ হলুম। কিন্তু শহরের বাইরে অসংখ্য লড়াই হয়েছে। আমাদের বাসার কাছাকাছি যে সব লরী আর ট্যাক্সী চালকরা থাকে তারা বলে যে প্রায়ই তাদের সঙ্গে মুক্তি ফৌজের ছোটখাট দলের দেখা হয়। কখনও কখনও মুক্তি যোদ্ধারা শতশত গাড়ী আর বাস থামিয়ে সভা করে। আমাদের ওখান থেকে আমরা প্রায়ই রাত্রে গুলি গোলার আওয়াজ শুনতে পাই। তুমি পাও ?'

ও মাথা নেড়ে সায় দিয়ে এক মনে আমার কথা শুনে যেতে লাগল। 'কোয়ংনাম থেকে আমাদের যে সব বন্ধুরা এসেছিল তারা বললে যে তোমাদের ঐ জেলাটার প্রায় সবটাই মুক্ত হয়ে গেছে। সমস্ত অঞ্চলটায় কয়েকহাজার মুক্তি যোদ্ধা রয়েছে। তাদের অস্ত্রশস্ত্রগুলোও ফরাসীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধের সময়কার অস্ত্রশস্ত্রের চেয়ে অনেক বেশী আধুনিক। এমনকি সায়গনের অবস্থাও মাত্র কয়েক মাস আগে যা ছিল তার থেকে একেবারে সম্পূর্ণ বদলে গেছে। তুমি যদি বাইরে বেরোতে পারতে তাহলে নিজের চোখেই দেখতে পেতে। এমনকি ছোট ছোট বাচ্ছারাও নুয়েন খানকে গালমন্দ করে। 'সরকারেরর' প্রতি কারোরই কোন সমীহ নেই। ছাত্র এবং তরুণ সম্প্রদায় তার বাড়ী ঘেরাও করে তাকে বাইরে বেরিয়ে এসে সর্বসময়ে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বাধ্য করেছে। তুমি কি মনে কর ব্যাপার স্যাপার এইভাবে আরও অনেকদিন চলতে পারে ?'

আমি ওর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে তুলেছিলুম। মনে হলো ও আগে যেমন রোগা হয়ে গিয়েছিল এখন আর ততটা রোগা নেই। হাসপাতালে যেমন দেখেছিলুম, নীল নীল শিরাগুলো আর তেমনি করে হাতের ওপর ফুটে নেই। যখন ওর আঙুলে হাত দিলুম তখন ও হেসে ফেললে। বললে: 'বিয়ের আঙটিটা আমি বিক্রি করে ফেলেছি। যে দিন আমি মাইনটা বসাবার জন্যে গেলুম সেদিন আমার তারে কম পড়ে গেল। সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ করার মত সময় তখন আমার ছিল না; এদিকে হাতে পয়সা কড়িও নেই। সহজে বিক্রি করতে পারি এরকম একটি মাত্র জিনিসই আমার কাছে ছিল তা হলো ঐ আঙটিটা। বিক্রি করে ফেললুম ওটা। নিজেকে বললুম—জীবনটাই যখন আমি

উৎসর্গ করতে ইচ্ছুক তখন একটা আঙটি বিক্রি করতে ইতস্তত করছি কেন ? এখন তুমি আমাকে ওটার কথা জিগ্যেস করলে তখন কোন যুতসই উত্তর আমার মাথায় এল না ; তাই বললুম যে এটার জন্যে আমার কাজের অসুবিধা হচ্ছিল। তুমি কি রাগ করেছিলে ?'

ওর দু'হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে আমি কাঁদতে লাগলুম : 'ওঃ, ওসব কথা আর বলো না। তখন আমি কি নির্বোধই ছিলুম। আমি যদি তোমার বিশ্বাস অর্জন করতে পারতুম, তাহলে তুমি আমাকে তোমার তারটা কিনে দেবার জন্যে বলতে। আমাকে বিশ্বাস করে তোমাকে ঠকতে হত না।'

'আমাদের বিয়ের ঠিক আগে আমি এই কাজের ভার পেয়েছিলুম। এখন তুমি বুঝতে পারছ, কাজটা ছিল খুবই বিপজ্জনক। নেতৃমণ্ডলী বিয়ের পরে বেড়িয়ে আসবার জন্যে আমাকে কয়েকদিনের ছুটি দিতে চেয়েছিল, কিন্তু আমি কাজটা চালিয়ে যাবার জন্যে জেদ ধরেছিলুম। আমেরিকান আগ্রাসক দস্যুদের খতম করার একটা সুযোগ পাবার জন্যে আমি এত দীর্ঘকাল ধরে অপেক্ষা করেছিলুম যে এখন তাদের একজন পাণ্ডাকে খতম করবার সুযোগ পেয়ে আমি কিছুতেই আর সে সুযোগ ছেড়ে দিতে পারলুম না। আমি সমস্ত কিছুই তোমার কাছ থেকে গোপন করেছিলুম, কারণ আমি তোমাকে দুর্ভাবনায় ফেলতে চাইনি। আমার ইচ্ছে ছিল যে কাজটা সমাপ্ত করার পরে তোমাকে সংগঠনের মধ্যে টেনে নেব। আমি সবসময়েই আশা করতুম যে তুমি আমার স্ত্রী হবার সঙ্গে সঙ্গে একদিন আমার কমরেডও হয়ে উঠবে।'

এরপর কিছুক্ষণ ও নীরব হয়ে বসে রইল, তারপর জিগ্যেস করল :

'তুমি কি মা হতে যাচ্ছ ?

আমি মাথা নাড়লুম :

'না।'

আমার মনে হলো যেন ও একটু নিরাশ হল, তাই আমি আর কিছু বললুম না। এই সময় প্রহরীটা এসে বললে যে সময় হয়ে গেছে। ত্রোইর বয়সী একজন সহ-বন্দী ঘরে এসে ঢুকল। ত্রোই তার সঙ্গে আমার পরিচয় করে দিল।

'আমার এখানকার বন্ধুরা আমাকে খুব সাহায্য করে।'

'আমার স্বামী অসুস্থ' আমি ওর বন্ধুকে বললুম। 'ওর দেখাশোনা করার জন্যে আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ।'

'ও কথা বলবেন না। যারা একসঙ্গে জেলখানায় থাকে, পরস্পরকে সাহায্য

করা তাদের একান্তভাবে উচিত। তার জন্যে ধন্যবাদের প্রশ্নই উঠে না। আমরা সবসময় একে অন্যকে সাহায্য করি সুতরাং কোন চিন্তা করবেন না।'

বিদায় নেবার সময় আমি যখন ত্রোইকে মোড়কগুলো দিলুম, তখন ও আর একবার আমাকে বললে: 'তোমাকে যদি আবার আসতে দেয় তাহলে আবার আমার জন্যে খাবার-দাবার কিনে অত বেশী টাকা পয়সা খরচ কোরো না।'

শ্রীমতী 'ম' আমাকে তাঁর নিজের পালিতা কন্যার মতই দেখতেন। যখন তিনি দেখলেন যে আমি অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও ত্রোইর দেখাশোনা করার জন্যে কাজ করে যাচ্ছি, খুব খাটাখাটনি করছি, তখন তিনি আমার জন্যে দুঃখ পেলেন।

তিনি বললেন: 'আমি যখন তোমার বয়সী ছিলুম তখন আমার স্বামীও জেলখানায় বন্দী ছিল, আর আমিও ঠিক তোমারই মতই কষ্ট পেয়েছি। আমি জেলখানায় গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতুম—তার জন্যে খাবার-দাবার নিয়ে যেতুম। ও ছাড়াও পেয়েছিল; কিন্তু তারপর আবার ওকে ধরে নিয়ে গিয়ে জেলে পুরল, আর শেষপর্যন্ত ঐ চি-হোয়া জেলখানাতেই ও মারা গেল।'

শ্রীমতী 'ম'-এর দুই ছেলে আর এক মেয়ে। তাঁর এক ছেলে সোভিয়েত ইউনিয়নে পড়াশোনা করছে আজ আট বছর। আরেকজন ছিল সৈনিক, সে নতুন করে উত্তরের সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। তাঁর মেয়ে চারবছর আগে ইস্তেহার বিলি করবার সময় গ্রেপ্তার হয়েছিল,—সেই পুস্তিকায় দক্ষিণ ভিয়েতনাম জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। শ্রীমতী 'ম' তাঁর এক ভাইঝির সঙ্গে থাকতেন আর জিনিসপত্র ফেরি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তিনি আমাকে কয়েকটা ফটো দেখিয়েছিলেন, সেগুলি লুকিয়ে চুরিয়ে দক্ষিণ ভিয়েতনামে এনে তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। সেগুলো সোভিয়েত ইউনিয়ন আর উত্তরে তোলা হয়েছিল: সাদা ওভারঅল পরা তাঁর ছেলে ডায়ালে ভর্তি একটা নিয়ন্ত্রণ প্যানেলের সামনে বসে আছে; জাতীয় দিবসে হানয়; তাঁর ছেলের বৌ—একজন কাপড় মিলের শ্রমিক—তার ছেলে মেয়েকে নিয়ে একটা উঁচু ঝুলবারান্দার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। শ্রীমতী 'ম' প্রত্যেকটা ফটোর পরিচয়ই আমাকে দিয়েছিলেন।

'একদিন আমরাও ওদের মত সুখী হব', তিনি বললেন।

তাঁর অন্তরটা ছিল অত্যন্ত কোমল। আমি যখন তৃতীয়বার ত্রোইর সঙ্গে দেখা করতে গেলুম, তখন তিনি ওর জন্যে অনেকগুলো উপহার পাঠিয়ে দিলেন।

তিনি বললেন, 'ওকে বোলো—চি-হোয়া জেলে আমার যে দু'জন ছেলেমেয়ে

রয়েছে তাদের কথা আমি যত ভাবি, আমার যে দুই ছেলে সোভিয়েত ইউনিয়ন আর উত্তরে রয়েছে—যারা এখন সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে আছে—তাদেরও কথা তত ভাবি না।'

চি-হোয়া জেলে তাঁর দু'জন ছেলেমেয়ে বলতে তিনি তাঁর মেয়ে আর আমার স্বামীকে বোঝালেন।

এবার আমি ছোট্ট ক্যানকে সঙ্গে নিয়ে গেলুম। ত্রোই সাধারণত যেখানে অপেক্ষা করত বারান্দা ধরে আমরা সেদিকে এগিয়ে গেলুম। ক্যানই প্রথমে ওকে দেখতে পেলে, আর সঙ্গে সঙ্গে ডেকে উঠল, 'তু দাদা!'

আমার খুব আনন্দ হল: এখন ওকে আরও স্বাস্থ্যবান দেখাচ্ছে, ওর মুখটা আর তত শুকনো দেখাচ্ছে না, তার ওপর চুলটাও কেটেছে! ও দরজার দিকে এগিয়ে এল। এখনও পা-টা টেনে টেনে হাঁটছে, সেটা এখনও সম্পূর্ণ সারেনি। কাছে এসে ও ছোট্ট ক্যানকে বুকে টেনে নিল। ক্যানের মাথার ওপর স্নেহভরে গালটা রেখে ও আমাকে জিগ্যেস করলে, 'বাবা মা ভাল আছেন?'

'তাঁরা খুব ভাল আছেন। তুমি একটু মোটা সোটা হয়েছ, তাই না?"

ও হাসল। গ্রেপ্তার হওয়ার পর থেকে ওকে আর কখনও এত সুস্থ দেখায়নি। আমার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে ও বললে:

'আমি তো মোটা হতেই থাকব। কিন্তু, তুমি এখনও খুব রোগা রয়ে গেছ। নিজেকে নিশ্চয়ই তুমি খুব খাটিয়ে মারছ।'

যাতে ও আশ্বস্ত হয় তেমনি ভাবে আমি উত্তর দেবার চেষ্টা করলুম:

'মোটেই না। আমি তোমার উপদেশ অনুসারেই চলেছি, দিনে আট ঘণ্টার একটুও বেশী কাজ করছি না।'

ছোট্ট ক্যানকে তখনও ত্রোই দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে আছে। ক্যান ওর মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিগ্যেস করল: 'তোমার কোন পা-টায় চোট লেগেছে?'

ও তার ডান পা-টা দেখিয়ে দিল:

'এইটা। তবে এখন অনেকটা ভাল হয়ে গেছে।'

ক্যান ওর ঠোঁট বাঁকাল।

'তাহলে আমায় কোলে নাও!'

ত্রোই ওকে কোলে তুলে নিল। তারপর জিগ্যেস করলে:

'স্কুলে যাচ্ছ তো তুমি? পড়তে টড়তে শিখেছ?'

'হাঁ আমি বর্ণমালা শিখেছি। তোমাকে দেখতে আসব বলে কুয়েনদিদি আমাকে স্কুল থেকে ছুটি করে এনেছে। তুমি কোথায় থাক ?'

'ওপরে চার তলাতে। অনেক উঁচুতে।'

'আমি ওপরে গিয়ে দেখতে পারব ?'

ত্রোই হেসে উঠল।

'না, তা তুমি পারবে না, আমি যে জেলখানায় আছি।'

'তুমি কখন বাড়ী ফিরে যাবে ?'

ত্রোই ওকে কথা দিল: 'চান্দ্র নববর্ষের দিন। তখন আমি নিশ্চয়ই বাড়ী ফিরে যাব। তুমি কিন্তু লক্ষ্মী মেয়ে হয়ে থাকবে, আর মাঝে মাঝে গিয়ে কুয়েনদিদির সঙ্গে দেখা করে আসবে, সেটা ভুলে যেওনা যেন।"

'যখনই আমি ওকে দেখতে যাই, তখনই দেখি ও কাঁদছে, ক্যান পাকা গিন্নীর ভঙ্গীতে বলে উঠল।

কথাটা শুনে ত্রোইকে বিচলিত দেখাল।

'সব সময় তুমি কান্নাকাটি কর কেন ?'

'কই, না তো।' আমি তর্ক জুড়ে দেবার চেষ্টা করলুম।

'যদি তা না হয়, তা হলে ও সে কথা বলবে কেন ? ও এখনও এত ছেলে মানুষ যে মিথ্যে কথা বলতে পারে না। ও যখন বলছে যে তুমি কান্নাকাটি কর, তখন তুমি নিশ্চয়ই তা কর।'

আমি বলবার মত কিছু ভেবে পেলুম না। তাই চুপ করে বসে রইলুম।

ত্রোই বলে চলল: 'দিনে দিনে প্রবল আকার ধারণ করছে, এ রকম একটা আন্দোলনের মধ্যে বাস করছ তুমি। এতে নিজেকে তোমার ভাগ্যবান বলে মনে করা উচিত। উচিত সকলের আনন্দে অংশ গ্রহণ করা। গত কয়েক দিন ধরেই জেলখানার কমরেডরা সমস্ত প্রাণমন ঢেলে দিয়ে গান গেয়ে চলেছে। সায়গনে সাধারণ ধর্মঘট ! জল আর বিজলী বিহীন সায়গন ! কী আনন্দ ! কী আনন্দ ! এর আগে ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হলে, মাত্র একটা শিল্পের শ্রমিকরা কিম্বা বড়জোর অল্প দু'একটা শিল্পের শ্রমিকেরা তাতে যোগ দিত। এবার সকলেই যোগ দিয়েছে। যখন আমি প্রথম যুবসঙ্ঘে যোগ দিলুম, তখন আমাকে একটা সংক্ষিপ্ত পাঠক্রমের শিক্ষা নেবার জন্যে পাঠান হলো। আমাদের শিক্ষকমশাই ছিলেন একজন চমৎকার লোক; তিনি অনেক বিষয় আমাকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। আমি ছিলুম একজন শ্রমিক. কিন্তু ঐ পাঠক্রমের শিক্ষাগ্রহণ করার

আগে পর্যন্ত আমি সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারিনি আমাদের শ্রেণীর, এই শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে কতখানি শক্তি প্রচ্ছন্ন রয়েছে। শিক্ষকমশাই একদিন আমাকে বললেন: 'তুমি তো একজন বিদ্যুৎ-কর্মী, তাই না? আচ্ছা, তাহলে বলতো—তোমার বাড়ীতে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ক'টা আছে?'

আমি উত্তর দিলুম, 'একটাও নেই। কেরোসিনের বাতিই আমাদের একমাত্র আলো। আর এ শুধু আমাদের একার নয়, আমি যে জেলায় বাস করি তার প্রায় সব ঘরেই ঐ একই অবস্থা।'

উনি হাসলেন, 'বিদ্যুৎকর্মীর ঘরেই বিজলী নেই। এটা কি তোমার ঠিক বলে মনে হয়? আর যাও, একবার আমেরিকানদের বাসাগুলোয় গিয়ে দেখে এস। তাদের কুকুরের খোঁয়াড়গুলোতে পর্যন্ত বিজলবাতি রয়েছে। বিদ্যুৎকর্মীরা শুধুমাত্র একদিনের জন্যে কাজ বন্ধ করে দিক, অমনি সমস্ত শহরটা পিচের মত অন্ধকারে ঢেকে যাবে। ওদের প্রত্যেকটা লোককে টর্চ হাতে নিয়ে অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াতে হবে। বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্র চালান সম্বন্ধে ওরা কি জানে?' আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁর কথা শুনতে লাগলুম, কিন্তু সেদিন আমি কল্পনা করতে পারিনি যে তাদের ক্ষমতা কতখানি তা দেখাবার জন্যে সমস্ত শ্রমিকরা একই সঙ্গে কাজ বন্ধ করতে রাজী হবে। কিন্তু হঠাৎ সেদিন দেখা গেল সারা জেলখানার চৌহদ্দির মধ্যে কোথাও বিজলী 'নেই'; কলে জল 'নেই'; গাড়ীঘোড়া লোকজন যাতায়াতের আওয়াজ থেমে গেছে, আর আমরা শুনতে পেলুম সেই খবর: সায়গনে সাধারণ ধর্মঘট হয়েছে। যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে, গাড়ীঘোড়া একটাও পথে বেরোয়নি, বাজার ঘাট সব বন্ধ, সমস্ত শহরের জীবন যাত্রা স্তব্ধ হয়ে গেছে। তখন আমাদের আনন্দ দেখে কে! বিপ্লবী সংগীতে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত বন্দীদের সমস্ত ব্লকটাকেই আমরা মুখরিত করে তুলেছিলুম। প্রহরীরা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল, এসে আমাদের পিটোতে শুরু করল। কিন্তু তখন কে গ্রাহ্য করে তাদের সে মার; আমরা গান গেয়েই চললুম। যদি ওরা তখন আমাদের খুনও করে ফেলত তবুও আমরা থামতুম না। আমরা বুঝতে পেরেছিলুম আমাদের শক্তি অসীম, আর সেদিন বেশী দূরে নেই যখন ওরা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে মাটিতে মিশে যাবে।

টেবিলের সামনে বসে থাকা পুলিশটা কয়েকটা সাময়িক পত্র ওলটাচ্ছিল। আমি চট্ করে থলেটা খুলে ত্রোইর জন্যে যে এক প্রস্থ জামাকাপড় বানিয়েছিলুম সেটা বের করলুম। সুঁচ সুতো দিয়ে লেখা রুমালটা ছিল সবচেয়ে নিচে। আমি সেটা বের করে

মুঠোর মধ্যে শক্ত করে ধরে ওকে ফিস্ ফিস করে জিগ্যেস করলুম: 'আমি যেসব জিনিপত্র তোমার জন্যে নিয়ে আসি তোমার সেলে ফেরবার পর ওরা কি সেগুলো পরীক্ষা করে দেখে নাকি.]'

ও মাথা নেড়ে বললে, হ্যাঁ তা দেখে।'

পুলিশটাকে অন্যমনস্ক করবার জন্যে আমি বারবার করে কেবল কাপড়চোপড়-গুলোর ভাঁজ একবার খুলতে আর তারপর আবার নতুন করে ভাঁজ করতে লাগলুম। তারপরে একসময় ত্রোইকে রুমালটা দেখিয়ে জিগ্যেস করলুম।

"তোমার কি মনে হয় ওদের নজর এড়িয়ে তুমি এটা নিয়ে যেতে পারবে?"

ও অবাক হয়ে রুমালটার ওপর লাল সুতোয় লেখা কবিতাটার দিকে তাকিয়ে রইল। "কিন্তু সূচ সুতো দিয়ে এর ওপরে এই লেখাটা কে লিখেছে?" ও জিগ্যেস করলে। ওর প্রশ্নটা শুনে আমি খুব খুশী হলুম, এই প্রশ্নটার জন্যেই আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলুম।

আমি উত্তর দিলুম, "আমিই লিখেছি। জেলখানার মেয়েরা আমাকে শিখিয়ে দিয়েছিল, কেমন করে লিখতে হয়।

ত্রোইর মুখের ওপর থেকে দৃঢ়তামাখা কঠিন ভাবটা মুছে গিয়েছিল। একটা পরিপূর্ণ সন্তোষের ভাব ফুটে উঠেছিল সেখানে।

"তুমি একজন চমৎকার গৃহিণী"—ও হেসে বললে। "তুমি যদি আর কয়েকটা মাস বেশী জেলখানায় থাকতে তো, তুমি আরও অনেক ভাল ভাল বিষয় শিখে যেতে। ঠিক আছে, এখন আমার কবিতাটা মুখস্থ হয়ে গেছে। সেলে গিয়ে অন্যান্য বন্দীদের আবৃত্তি করে শোনাব। এটাকে এবার লুকিয়ে, বাড়ী ফিরিয়ে, নিয়ে যাও। ওরা যদি তোমার কাছে তল্লাশি করে, আর এটাকে খুঁজে পায় তাহলে তোমাকে ঠেঙিয়ে মেরে ফেলবে।'

'জেলের বন্ধুরা আমাকে একজোড়া বালিশের ওসারের ওপর সুতো দিয়ে ফুল তুলতেও সাহায্য করেছে। আমাদের বিয়ের উপহার হিসাবে আমরা যে দু'টো পেয়েছিলুম এ দু'টোও ঠিক সেইরকম সুন্দর হয়েছে। ওরা বলেছে যে বালিশের ওসার দু'টো হলো আমাদের বিয়েতে দেওয়া ওদের উপহার।'

'ওরা তোমাকে অনেকগুলো গান শিখিয়েছে, তাই না?'

'হ্যাঁ, বেশ কয়েকটা: আমাদের বীরদের জন্যে আমরা পোশাক বানাই, হিয়েন লুং সেতুর ধারে, আশার গান, কমিউনিস্ট তেজস্বিতা, তোমার জন্মভূমি

হলো কমিউনিস্ট বসন্ত; আর বেশ কয়েকটা কবিতা, যেমন: মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিতের গান, কদম কদম বাড়িয়ে চল……'

আমি যখন একটা একটা করে আর কবিতাগুলোর নাম বলে যাচ্ছিলুম, তখনও ও নামগুলো আবৃত্তি করছিল আর সেগুলো গুণছিল।

'তাহলে তুমি কমিউনিস্টদের গানও শিখেছ। খুব ভাল কথা। একজন শ্রমিক হিসেবে এ সব গান তোমার একান্ত ভাবে জানা উচিত। বয়স্ক কমরেডরা আমাকে বলেছেন যে, যখন আমরা কমিউনিস্ট সমাজ প্রতিষ্ঠা করব, তখন সকলেই সুখে থাকবে, প্রত্যেকেই তার পরিশ্রমের ফল ভোগ করতে পারবে, অসুখী কেউ থাকবে না। উত্তর ইতিমধ্যেই সেই পথে যাত্রা শুরু করে দিয়েছে। যদিও এখন আমি কমিউনিস্ট হইনি, তবুও আমি একজন কমিউনিস্ট-এর মত বাঁচতে চাই, একজন কমিউনিস্ট-এর মত লড়াই করতে চাই।'

'গানগুলো আমি ঠিকমত জানি না, কারণ সেগুলো আমি শিখে নিতে পারিনি। যে কমরেডটি আমাদের এই গানগুলো শিখিয়েছিল, তাকে এর জন্যে মার খেতে হয়েছিল। কিন্তু সেলে ফিরে সে আবার গান শেখাতে শুরু করলে। কিছুতেই আমাদের বারণ শুনলে না। সে বললে: 'জেলখানায় গান শেখান একটা বৈপ্লবিক কাজ, আর গান শেখাও তাই, কারণ এর ফলে একজনের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় আর সে ভবিষ্যতের আশাতেও প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে।'

'ওখানে ঐ শুয়োরটা রয়েছে বলে তাই, তা না হলে আমি তোমাকে কয়েকটা পংক্তি গেয়ে শোনাতে বলতুম, আমাদের জেলখানার কমরেডরা আমাদের ভালবাসে, তার কারণ আমরা সকলে একই আদর্শে বিশ্বাসী। ওদের আদর্শ অনুসরণ করার চেষ্টা কোরো. সোনা আমার।

'আমি তোমার সঙ্গে থাকি আর না থাকি, ওদেরই মত করে জীবন যাপন কোরো; ওদের মতই বিপ্লবের প্রতি বিশ্বস্ত থেকো। যদি ওদের কারো সঙ্গে আবার দেখা হয়তো বোলো যে আমার স্ত্রীর প্রতি ওরা যে যত্ন নিয়েছে, তাকে যে শিক্ষা দিয়েছে, তার জন্যে আমি ওদের কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।'

কিছুক্ষণের জন্যে ওকে একটু চিন্তা মগ্ন দেখাল। তারপর ওর কথাবার্তায় গাম্ভীর্যের ভাবটা কমে এল, ও আবার বেশ সহজ ভাবেই কথা বলতে লাগল। আমার চুলের মধ্যে হাত বুলোতে বুলোতে, ও আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বললে, 'এই দেখ, আবার তুমি কাঁদতে শুরু করলে। কেঁদ না লক্ষ্মীটি। দুঃখকষ্ট সহ্য করতে শেখ। মনে করে দেখ দেখি, সাধারণ পুলিশ বিভাগের জেলখানায় তুমি

তোমার সহবন্দীদের আমাকে বলবার জন্যে কি বলেছিলে? বলেছিলে সেখানে তুমি খুব হাসিখুশি আছ, সব সময় তাদের সঙ্গে গান টান ক'রে কাটাচ্ছ।'

নিজেকে জোর করে হাসিখুশি দেখাবার জন্যে ও আমার দিকে চেয়ে হাসল, কিন্তু ওর দু'চোখ জলে ভরা। ও যে মরতে চলেছে—এই হৃদয়বিদারী চিন্তার হাত থেকে আমাকে ভুলিয়ে রাখবার জন্যে ও আমাকে সুদূর ভবিষ্যতে মানুষ কত সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে আমাকে সেই কথা শোনাতে শুরু করল। তারপর কিছুক্ষণ ও ছোট্ট ক্যানের সঙ্গে খেলা করল, ওকে কথা দিল যে ছাড়া পাবার পর ওকে নিয়ে জেটির কাছে পার্কে বেড়াতে যাবে, আর ওকে কেক খাওয়াবে। (আমাদের বিয়ের অনুষ্ঠানের ঠিক পরেই বাড়ী ফেরার পথে, আমরা বাচ্চাটাকে নিয়ে ওই দিকে বেড়াতে গিয়েছিলুম)। ও আমাকে ওর ম্যাণ্ডোলিনটা যত্ন করে তুলে রাখতে বললে: চাঁদের আলো-ঝলমলে রাতে আশপাশে বাচ্চারা আসতো ওর বাজনা শুনতে।

তারপর যখন আমার বিদায় নেবার সময় হয়ে গেল, তখন ও বললে; '১৫ই অক্টোবর যদি ওরা তোমাকে দেখা করতে না দেয়, কিন্তু খাবারের ঠোঙা টোঙা পাঠাতে দেয়, তাহলে আমাকে একটা চিঠি পাঠিয়ে দিও। আমি সেটার আশায় থাকব।'

আমাকে ওর কাহিনী শোনাবার মধ্যেই কুয়েনকে বারবার গিয়ে তরুণী গেরিলা যোদ্ধাদের সভায় যোগ দিতে হচ্ছিল। সেইসব সভায় তারা বর্ণনা করত—ত্রোইর হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্যে তারা যেসব সংগ্রাম চালাচ্ছে সেইসব সংগ্রামের কাহিনী—তার কোনটাতে তারা শুধু অংশ গ্রহণ করেছে, আবার কোন কোনটাতে দিয়েছে নেতৃত্ব। আমার সঙ্গে তার শেষবারের কথাবার্তার সময় কুয়েন আমার কাছে তার মনোভাব প্রকাশ করল:

'ওঃ, কত লড়াই-ই না ওরা লড়েছে! সেসব কাহিনী শুনতে শুনতে আমি একেবারে হতবাক হয়ে গিয়েছিলুম! এইসব কমরেডদের বয়স আমারই মত বছর কুড়ি হবে, কিন্তু ওদের কাহিনী শোনার সময় মনে হচ্ছিল যেন আমি একটা ছোট্ট খুকী, বড়দের অভিজ্ঞতার গল্প শুনছি। ওদের মধ্যে একটা মেয়ে, আমারই মত ছোটখাট চেহারা। সে একশটারও বেশী লড়াই লড়েছে, আর সে চার পাঁচ রকমের আগ্নেয়াস্ত্র চালাতে পারে। এমনকি সে অনেকগুলো ইয়াংকি দস্যুকেও বন্দী করেছে। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত ওদের কাহিনী শুনছিলুম আর ভাবছিলুম মহাসভাটা শেষ হয়ে যাবার পর আমিও ওদের দলে যোগ দিতে পারব কি না।

যদি তা না পারি, তাহলে আমার ইচ্ছে আমি একটা সৈন্য দলে যোগ দেব। আমার স্বামী ছিলেন একটা হঠাৎ আক্রমণকারী ক্ষুদ্র সৈন্যদলের (Commando unit) মুক্তিযোদ্ধা। এই দলটা কাজ করত সায়গনে। সৈন্যদলে যোগ দেবার অল্প কিছুদিন পরেই তাঁর ওপর ম্যাকনামারাকে খতম করার ভার দেওয়া হয়। ও স্বপ্ন দেখত যে ও একজন মুক্তিযোদ্ধা হবে আর এই সায়গনেই লড়াই চালাবে। ও স্বেচ্ছায় সৈন্যদলে যোগদান করার জন্যে যে আবেদন করেছিল, সেই আবেদন পত্রখানা ওদের অধিনায়ক যত্ন করে রেখে দিয়েছেন। তাতে ও ব্যক্ত করেছে, কেন ও সাম্রাজ্যবাদীদের ঘৃণা করত আর শপথ নিয়েছে 'শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার।' আমি ওরই পথ অনুসরণ করতে চাই, আমি ওর হত্যার প্রতিশোধ নিতে চাই। আমি বন্দুক হাতে শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে চাই, অথবা এমন কিছু করতে চাই যাতে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য হয়, তা যাই হোক না কেন। কারণ এরা হলো আমার স্বামীর সংগ্রামের সাথী।

কি বলব ভেবে না পেয়ে আমি ইতঃস্তত করতে লাগলুম। ও বলে বসল:

'আমি আমার বন্ধু, নারী গেরিলাদের জিগ্যেস করেছি। ওরা বললে গেরিলা যুদ্ধ বেশী কঠিন নয়। যে কেউ গেরিলা যোদ্ধা হতে পারে যদি শত্রুকে মনে প্রাণে ঘৃণা করে; তার ঘৃণা যত গভীর হবে সেও তত ভাল লড়াই করতে পারবে। বন্দুক চালান শিখতে বেশী সময় লাগে না। এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে প্রাণপণ চেষ্টা করলে আমি ওদের উপকারে লাগবই লাগব। শত্রুর প্রতি ঘৃণায় আমার সমস্ত অন্তর পূর্ণ হয়ে আছে, আর আমি মুক্ত অঞ্চলে এসেছি, ত্রোইর হত্যা আর আমার দুর্দশার প্রতিশোধ নেব বলে।'

ও তার পুঁটলি থেকে কাল কাপড়ের একপ্রস্থ আনকোরা নতুন পোশাক বের করল, তারপর একটু হেসে আমাকে বললে:

'এখানকার অধিবাসীরা আমাকে অনেক উপহার দিয়েছে। ঠাণ্ডা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা আমাকে কম্বল আর গরম কাপড়-চোপড় এনে দিয়েছে। কিন্তু আমার কাছে সবচেয়ে মূল্যবান উপহার যেটার কথা ভেবে আমি সারাদিন আনন্দ পেয়েছি, সেটা হলো এই কাল পোশাকটা। সায়গন থেকে পালাবার পর থেকে আমি বহুদিন ধরে মুক্ত অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে হেঁটেছি; বহু নারী গেরিলা ক্যাডার, সৈনিক… প্রভৃতির সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে; সকলের পরণেই এই কাল পোশাক! আমার পথ প্রদর্শক, সংযোগরক্ষাকারী কমিটি (Liaison agent) আমাকে বললে: "এটাই যুদ্ধের পোশাক। যুদ্ধের এলাকায় (War Zone) নারী, পুরুষ সকলেই

এই পোষাক পরে। ঐ রকম একপ্রস্থ কাল পোষাক আমি চেয়েছিলুম, আর আজ সকালে যখন আমাকে একটা এনে দিলে তখন আমার কি আনন্দ যে হলো কি বলব! এই মহাসভা শেষ হয়ে গেল আমি এটা পরে নারী গেরিলা এবং অন্যান্য অল্পবয়সী নারী প্রতিনিধিদের সঙ্গে দক্ষিণ ভিয়েতনামী যুব মহাসভায় যোগ দিতে যাব।

সেইদিন সন্ধ্যেবেলা থেকে শুরু করে অনেক রাত পর্যন্ত বসে বসে কুয়েন আমাকে তার স্বামীর কাহিনীর শেষ অংশটা শোনাল।

৮ই অক্টোবর সায়গনের সমস্ত সংবাদপত্র ঘোষণা করল যে আগামী সপ্তাহে ত্রোইর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে। আমাকে এই সাংঘাতিক খবরটা এনে দিল একটা ছোট্ট খবরের কাগজের ফেরিওয়ালা, উত্তেজনায় তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। হ্যান ডং (যুদ্ধ) (Action) কাগজের প্রথম পৃষ্ঠাতেই মোটা মোটা রেখা দিয়ে ঘেরা একটা জায়গায় মধ্যে এই লাইনগুলো ছিল: "প্রকাশ্য মৃত্যুদণ্ড। যিনি প্রথম গুলি বর্ষণকারী দলের (firing Squad) সামনে হাজির হবেন তিনি হলেন সেই ব্যক্তি যিনি গত মে মাসে মিঃ ম্যাকনামারার যাওয়ার পথে কংলী সেতুর নীচে মাইন পেতে রেখেছিলেন।" কয়েকটা সংবাদপত্র বেশ খোলা-খুলিভাবেই বললে যে জনসভা, বিক্ষোভ মিছিল, ধর্মঘট, ইত্যাদি ব্যাপক ভাবে ছাড়িয়ে পড়ছে দেখে যুক্তরাষ্ট্র খানচক্র জনগণের প্রতিরোধ আন্দোলনকে দমন করার জন্যে বেশ কয়েকজনকে এইভাবে প্রকাশ্যে প্রাণদণ্ড দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আমি ছুটি চাইবার জন্যে তাড়াতাড়ি ছুটে গেলুম কারখানায়, যাতে ত্রোইর প্রাণদণ্ড স্থগিত রাখার একটা উপায় করার জন্যে যথেষ্ট সময় পাই। কারখানার বহু মেয়ে আমাকে দেখে চোখের জল মুছতে মুছতে নিঃশব্দে মুখ ফিরিয়ে নিলে। সাধারণ অবস্থায় আমার বান্ধবীরা বক বক্ করে করে মাথা ধরিয়ে দেয়, আর এখন দুঃখে তারাও নির্বাক হয়ে গেছে। কারখানার অফিস ঘর থেকে যখন আমি বেরিয়ে এলুম তখন ওদের একজন আমার সঙ্গে সঙ্গে কিছু দূর এল; সে আমার কানে কানে বললে:

'এখানে বড়রা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে যে একটা ভয় দেখান ছাড়া কিছু নয়' শাসন কর্তৃপক্ষ এটা কার্যকর করতে সাহস পাবে না। তাই বলছি, বেশি বিচলিত হয়ো না, নিজেকে সংযত করে রাখো।'

আমি যখন আমার বাপের বাড়ী গিয়ে হাজির হলুম, তখন একদম হাঁপিয়ে

গেছি। গিয়ে দেখি বাবা একজন খরিদ্দারের চুল কাটছেন, তাড়াতাড়ি হাতের কাজটা সেরে নিয়ে তিনি আমাকে একজন উকিলের কাছে নিয়ে গেলেন। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত বন্দীদের ব্লকে যখন আমি প্রথমবার ত্রোইর সঙ্গে দেখা করি তখন ও আমায় যা বলেছিল তা আমার স্পষ্ট মনে পড়ল :

'উকিল ধরো না, ওতে শুধু শুধু একরাশ টাকা নষ্ট হবে।' কিন্তু এখন আমি বুঝতে পারলুম যে ওর বারণ শোনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত ওর মৃত্যুদণ্ড স্থগিত রাখার বিন্দুমাত্র আশা থাকবে ততক্ষণ আমি সর্ব প্রকারে চেষ্টা চালিয়ে যাব, কোন রকম খরচ খরচারই পরোয়া করব না, দৈনিক কাগজগুলোর ওপর যখন আমি চোখ বোলাতুম, তখন ভয়ে আমার বুকে হাতুড়ী পেটা করত। ১৫ই অক্টোবর আর একটি বার শুধু যদি ওকে দেখতে পাই!

১১ই অক্টোবর; রবিবার বিকাল বেলা উকিলের অফিস থেকে ফিরলুম তাঁকে তাঁর ৫,০০০ পিয়াস্ত্রা ফী গুণে দিয়ে। আমি বাড়ীর দরজায় পৌছুতে না পৌছুতে আমার ছোট বোনটা চেঁচিয়ে উঠল, 'তু-কে আর মরতে হবে না!'

আমার এত রাগ হলো যে আমি ওর দিকে ফিরেও তাকালুম না—এটা কি এরকম ঠাট্টা তামাসার সময়! চরম বিষাদ আর হতাশায় আমার অন্তর ছেয়ে গেল, নির্বাক হয়ে আমি সেখানে দাঁড়িয়ে রইলুম। তখন ও আমার হাতে একখানা খবরের কাগজ গুঁজে দিয়ে বলে উঠল :

'খবরের কাগজেই একথা লিখেছে। দেখ, ঐ তুর ছবি।'

তখন আমি থিয়েন চি (শুভেচ্ছা) শাসক কাগজটায় ছাপা ওর ছবিটার দিকে তাকালুম। তাতে দেখা যাচ্ছে—ত্রোই একটা টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে আছে, টেবিলের ওপর একটা মাইন আর একটা তারের কুণ্ডলী। খবরের শিরোনামটা ছিল এই : 'একটা টেলিফোনের ডাক। ভিয়েত কং 'নুয়েন ভ্যান ত্রোইর জীবনের বিনিময়ে একজন আমেরিকান কর্নেলের জীবন।'

খবরের বিবরণটা ছিল এই :

জেনেজুয়েলার গেরিলারা একজন আমেরিকান কর্ণেলকে বন্দী করেছে আর ভিয়েত কং নুয়েন ভ্যান ত্রোইর জীবনের সঙ্গে তার জীবন বিনিময়ের প্রস্তাব করেছে। তারা ঘোষণা করেছে যে যদি নুয়েনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় তা হলে তার এক ঘণ্টার মধ্যে কর্ণেল স্মোলেনকে গুলি করে মেরে ফেলা হবে।'

আমি বিস্ময় বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইলুম। কথাটা বিশ্বাস করার সাহসও

হলো না। কি হতবুদ্ধিকর ব্যাপার! মাঝে মাঝে কাগজে যে রকম বেরোয় এটাও কি সে রকম একটা ধোঁকা বাজি?

পাড়া পড়শীরা অন্যান্য সব খবরের কাগজ নিয়ে এসে হাজির হতে লাগল আর আমাকে অভিনন্দন জানাতে লাগল।

একজন বললে, 'তোমার স্বামীর মৃত্যুদণ্ড হয়েছে একথা শোনার পর থেকেই তোমার জন্যে আমার খুব কষ্ট হত। তোমার মত অল্প বয়সে স্বামীহারা হওয়া কি সংঘাতিক দুঃখেরই না কথা!'

আর একজন বললে, "আমি ভেবেছিলুম, এবার হয়তো ওকে মরতেই হবে। কি অদ্ভুত আর সেই সঙ্গে কি আনন্দের কথা যে কোন এক দূর দেশের লোকেরা ওর প্রাণ রক্ষা করছে। কি রকম ভদ্র আর শান্ত শিষ্ট প্রকৃতির ছেলে ও। কে ভেবেছিল যে ও ঐ রকম একটা কাজ করতে পারে!'

আমি একটা একটা করে সমস্ত কাগজগুলো পড়লুম, দেখলুম তারা সবাই-ই প্রায় একই কথা বলেছে। খবরের শিরোনামগুলোই যা একটু আধটু আলাদা! তাদের একটা ছিল: 'কমিউনিস্টদের কাছ থেকে একটা টেলিফোনের ডাক।'

আরও বেশি খবরাখবর পাবার জন্যে আমি ফু মুয়ানে আমার নিজের বাড়াতে ফিরে গেলুম। যাবার সময় পথের মাঝে আমি একটা চেনা গলা শুনতে পেলুম—আমার নাম ধরে ডাকছে। দেখলুম—আমার চেনা-শোনা একজন লোক একটা বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে আমাকে হাতের ইসারায় ডাকছেন।

'ভেতরে এস', তিনি বললেন, 'ব্যাপারটা জরুরী।'

ঘরের ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমাকে দু'টো খবরের কাগজ দেখালেন, আর বললেন:

'তোমার ভাগ্য খুব ভাল, মা আমার। যদিও ত্রোইর বোমাটা ফাটেনি, তবুও তাদের প্রতিরক্ষা সচিবের মত একজন হোমড়া চোমড়া লোককে খতম করার চেষ্টা করেছিল বলে, আমেরিকানরা ওকে খুন করতে যাচ্ছিল। এখন, একেবারে শেষ মুহূর্তে, সমস্ত ব্যাপারটা উল্টে ওদের ঘাড়েই চেপেছে।'

পাশের ঘর থেকে তাঁর মেয়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে উত্তেজিত স্বরে বললে:

'ওঃ, কুয়েন দিদি! স্কুলে আমরা সবাই কত যে খুশী হয়েছি, কী বলব! আজই দুপুরে ত্রোইর কথা আলোচনা করবার জন্যে আমরা একটা সভা করেছি। সারা পৃথিবীতেই ওর পরিচয় ছড়িয়ে যাচ্ছে, তাই না? এমনকি, কোথায় সেই

সুদূর দক্ষিণ আমেরিকা, সেখানকার লোকও জেনে গেছে যে ও বন্দী হয়েছিল আর ওর প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করছে।' স্কুলের একজন বন্ধু আমায় বললে: সারা সায়গণের মধ্যে আজ সবচেয়ে সুখী হচ্ছে ত্রোইর বউ।'

আমি কি বলব বুঝতে পারছিলুম না, কারণ আমি জানতুম না, খবরটা সত্যি না মিথ্যে। তাই আমি শুধু একটু হাসলুম। তার বাবা বললেন:

'আমি তাহলে ঠিকই আঁচ করেছিলুম। ত্রোই প্রায়ই আমাদের বাড়ীতে আসতো। আর ওর কথার ধরণ-ধারণ দেখেই আমার ধারণা হয়ে গিয়েছিল ও কোন ধরণের লোক। ও এখানকার আর সব ছেলে ছোকরাদের মত ছিল না। আমেরিকানদের সম্বন্ধে একটা ভাল কথাও কখনো ওর মুখে শুনিনি। কিন্তু উত্তর সম্বন্ধে ও খুব চমৎকার চমৎকার কথা বলত।'

যখন আমি বাড়ী পৌঁছুলুম তখন দেখি অনেক পাড়াপড়শীরাই আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আমাকে দেখেই ওরা ক্ষ্যাপাতে শুরু করলে,

'এখন বরকে বরণ করে ঘরে তোলার জন্যে তৈরি হও। এবার তুমি আনন্দে দু'চার ফোঁটা চোখের জল ফেলবে, কি বল?'

ফুন্নয়ানের অধিবাসীরা খুবই গরিব। তাদের সকলেই ফেরিওয়ালা। তাদের মধ্যে একজনও কখনো বই বা খবরের কাগজ পড়েছে কিনা সন্দেহ। তাদের মধ্যে কেউই জানতো না ভেনেজুয়েলা কোথায়। তারা অবাক হয়ে ভাবতে লাগল যে ভেনেজুয়েলার লোকেরা ত্রোইর আসন্ন প্রাণদণ্ডের কথা এত তাড়াতাড়ি জানতে পারলে কি করে? আর তার চেয়ে বেশী বিস্ময়ের কথা ত্রোইর সঙ্গে বিনিময় করার জন্যে ওরকম একজন উচ্চপদস্থ আমেরিকান অফিসারকে বন্দী করলে কি করে? তারা আমাকে সেই দেশটার কথা জিগ্যেস করলে, কিন্তু আমি তাদের থেকে বেশী কিছুই জানতুম না। ভেনেজুয়েলা একটা বড় দেশ না ছোটখাট দেশ, দেশটা ধনী না দরিদ্র—কিছুই আমি বলতে পারলুম না। শুধু একটা বিষয়ে আমি নিশ্চিত ছিলুম: আমেরিকান বিরোধী গেরিলারা নিশ্চয়ই সেখানেও সক্রিয় রয়েছে, ঠিক যেমন রয়েছে এখানে, দক্ষিণ ভিয়েতনামে। আর সেইজন্যেই সেখানকার জনসাধারণ ত্রোইর ওপর সহানুভূতিশীল।

ক্রমে ক্রমে আরও অনেকে আসতে লাগল, আর সঙ্গে নিয়ে আসতে লাগল সমস্ত রকমের খবরের কাগজ। সায়গনের খবরের কাগজগুলোর নিশ্চয়ই সেদিন রেকর্ড সংখ্যক বিক্রি হয়েছিল।

'অ'-খুড়ো জন্মেও কোনদিন ছাপার হরফে খবর পড়েননি। তিনিও একখানা

সংমোই (নতুন জীবন) সঙ্গে নিয়ে এসে হাজির। বললেন :

'বাজারে মাদুর বিক্রি করতে করতে গুজব শুনলুম—যে লোকটা কংলী সেতুটা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল সে মরণের হাত থেকে বেঁচে গেছে। খবরের কাগজের ফেরিওয়ালারা বুকের সবটুকু দম খরচ করে চেঁচাচ্ছে : 'অতিরিক্ত সংখ্যা! সর্বশেষ খবর! একটা টেলিফোনের ডাক একটা জীবন বাঁচাচ্ছে!' ত্রোইর নাম শুনেই আমি একখানা কাগজ কিনে ফেললুম। আমি পড়তে পারি না, কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি যে এটা ওর ফটো।'

অনেক লোক কাজ থেকে বাড়ী ফেরার পথে দেখা করতে এল। যাদের যাদের তাড়াতাড়ি ছিল তারা লাল পেন্সিল দিয়ে ত্রোইর খবরটার চারপাশে দাগ দিয়ে খবরের কাগজগুলোই রেখে যেতে লাগল। বহুদিন ধরে একটানা দুঃখ আর আশংকার আঁধারের মধ্যে কাটাবার পর আমার বাড়ীটা আবার হাসি-গল্পে ভরে উঠল। সকলেই ভাবলে আমার স্বামীর প্রতি ভেনেজুয়েলীয়দের কেন যে এত গভীর ভালবাসা তা আমি নিশ্চয়ই জানি।

সেই দিনই সন্ধ্যেবেলা আমি 'জ' খুড়োর সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। ভাবলুম তিনি বোধহয় আমাকে এই জীবন বিনিময়ের ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতে পারবেন। 'জ' খুড়ো ত্রোইকে বেশ ভাল করেই চিনতেন। তিনি আমাদের বিয়েতেও এসেছিলেন। দিয়েমের শাসনকালে তিনি কয়েক বছর জেলও থেকেছেন। ছাড়া পাবার পর তিনি বাড়ীতে বসে কিছু হিসেব-নিকেশের কাজকর্ম করে জীবিকা নির্বাহ করেন। তিনি আমাকে যা বললেন তা হলো :

'আজকের দিনে আমেরিকানরা পৃথিবীর সর্বত্রই প্রতিরোধের সম্মুখীন হচ্ছে। তোমার স্বামী যখন আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতো তখন এই সম্বন্ধে কথাবার্ত বলত। সে কি এ সম্বন্ধে তোমাকে কিছুই বলেনি?'

'মানে, সায়গনে যে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম চলছে একথা ও আমাকে বলেছে, কিন্তু আর কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে সে সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু জানি না।'

'ভেনেজুয়েলাতেও ঠিক একই ব্যাপার ঘটছে। এ দেশটা যুক্তরাষ্ট্রের আরও কাছে, তাই সেখানে আমেরিকানদের উৎপীড়ন আরও বেশী প্রচণ্ড। সেখানে প্রচুর তেল পাওয়া যায়, কিন্তু সে তেল লুটে নিয়ে যায় ইয়াংকি ডাকাতরা। সেই জন্যেই ভেনেজুয়েলীয়রা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে। ঠিক দক্ষিণ ভিয়েতনামের মতই ভেনেজুয়েলাতে গেরিলা যোদ্ধারা আছে, আর আছে যুক্তরাষ্ট্র-বিরোধী

জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট। তোমার স্বামী যদি ম্যাকনামারাকে খতম করে দিতে পারতো, তাহলে সারা ভেনেজুয়েলা আনন্দমুখর হয়ে উঠত, কারণ যে শত্রুরা তাদের দেশে অনুপ্রবেশ করছে, তাদের দেশের 'জনসাধারণকে পাইকারী হারে হত্যা করছে, নির্বিচারে গ্রেপ্তার করে জেলে পুরছে তারা আর দক্ষিণ ভিয়েতনামের শত্রুরা এক ও অভিন্ন। সেই জন্যেই তোমার স্বামীর গ্রেপ্তারের খবর তাদেরকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। ভেনেজুয়েলাতেও হাজার হাজার লোক জেলখানায় পড়ে পচছে, অসংখ্য ভেনেজুয়েলানকে ঘাতকরা প্রাণদণ্ড দিয়েছে, তবুও ভেনেজুয়েলীয় গেরিলারা প্রথমে ভেবেছে তোমার স্বামীর কথা, দক্ষিণ ভিয়েতনামের কথা…।'

তিনি মানচিত্রে ভেনেজুয়েলা বের করে দেখালেন, তারপর বললেন,

'সায়গনের লোকেরা হঠাৎ এই দেশ সম্বন্ধে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। এমনকি আমার স্ত্রীও তখন থেকে আমাকে জিগ্যেস করছে, ভেনেজুয়েলা আর আমাদের দেশের মধ্যে এরকম একপ্রাণ হবার কারণ কি ?'

যখন আমি জেলখানায় ছিলুম, তখন প্রহরীরা কাছাকাছি না থাকলে ভগিনী 'জ' প্রায়ই আমাদের রাজনৈতিক কথা শোনাত। সেই সময় ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের জনগণের আমেরিকান বিরোধী সংগ্রামের পিছনে সমস্ত বিশ্ববাসীর সমর্থনের কথা আমাদের বলেছিল। সে সময় আমি কল্পনা করতে পারিনি, সেই সমর্থন বলতে কি বোঝায়। কিন্তু আজ যে খবর ভেনেজুয়েলা থেকে এলো আর নাড়া দিল সমস্ত সায়গনের অন্তরকে, তা আমার চোখ খুলে দিল : আমাদের দূরদেশী বন্ধুরা শুধু যে এই টুকুই জানে যে আমাদের দেশের জনগণ আমেরিকান আগ্রাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে তা নয়, তারা ঘটনার গতির ওপর এমন তীক্ষ্ণ নজর রাখছে যে ইয়াংকি ঘাতকদের হাতে খুন হতে যাচ্ছে এমন একজন দক্ষিণ ভিয়েতনামীর নাম পর্যন্ত তারা জানে। এই আন্তর্জাতিক সমর্থন আমার স্বামীর মামলার (case) চারপাশে সমবেত হচ্ছে। ওর সাংগ্রামের সঙ্গে যে শুধু সায়গনের, শুধু দক্ষিণ ভিয়েতনামের স্বার্থই জড়িত ছিল তাই নয়, জড়িত ছিল সারা বিশ্ব স্বার্থ।

পথে চলবার সময় শুনতে পেলুম লোকে এই জীবন বিনিময়ের কথা আর সুদূর লাতিন আমেরিকার একটা দেশের সংগ্রাম আর আমাদের নিজেদের দেশের সংগ্রামের মধ্যে সম্পর্ক যে কত নিকট সেই আলোচনা করছে। শুনে আমার মন আনন্দ আর গর্বে ভরে গেল। এটা পরিষ্কার যে এ আনন্দ কেবল আমার একার নয়। সকলেই ত্রোইর অদৃষ্টের কথা বলাবলি করছে, মৃত্যুর হাত এড়াবার এই যে সুযোগ ও পেয়েছে তার জন্যে সকলেই সুখী। পুলিশ আমার ওপর তীক্ষ্ণ নজর

রাখছিল, তা সত্বেও লোকের এই সুখবরের জন্তে আমাকে অভিনন্দন জানাতে আসা বন্ধ হলো না। সারা সায়গনই এই খবর নিয়ে গুঞ্জনে মুখর হয়ে উঠেছিল। খবরের কাগজের ফিরিওয়ালারা এই শুভ সংবাদটা হাঁকতে হাঁকতে রাস্তায় রাস্তায় ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছিল—যেন ওরা প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে খবরটা পৌছে দেবে বলে পণ করে লেগেছে: 'যে ম্যাকনামারাকে খুন করার চেষ্টা করেছিল সে বেঁচে গেল!' 'যে ম্যাকনামারার প্রাণনাশ করার চেষ্টা করেছিল সে বেঁচে গেল!' তাদের মধ্যে একজন একখানা খবরের কাগজকে টুপির মত করে মুড়ে মাথায় পরেছিল, সেটার সামনে দিকে ত্রোইর একটা ছবি—তাতে দেখা যাচ্ছে বিচারকদের মুখোমুখি ও দাঁড়িয়ে, আর মুখে ওর আত্মবিশ্বাসের হাসি। রবিবারে ত্রান হুং দাও এভিনিউতে পথচারীদের প্রচণ্ড ভীড়। হাতে একখানা থিয়েন চি (শুভেচ্ছা) কাগজ উঁচু করে ধরে ফিরিওয়ালাটা ঠেলাঠেলি করে সেই ভীড়ের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলল। কাগজটার প্রথম পৃষ্ঠাতে প্রকাণ্ড হরফে শিরোনাম, কুড়ি গজ দূর থেকেও তা পড়া যায়: 'নুয়েন ভ্যান ত্রোইর প্রাণদণ্ড স্থগিত!' তার খরিদ্দারদের বাকী পয়সা ফেরৎ দেবার সময়ও সে হেঁকে চলেছিল: 'কমিউনিস্টদের কাছ থেকে একটা টেলিফোনের ডাক ভিয়েতকং নুয়েন ভ্যান ত্রোইর প্রাণ বাঁচিয়ে দিয়েছে।'

আমি আমার এক বন্ধুর বোন 'ঙ'-এর কথা চিন্তা করলুম। সে একটা স্কুলের ছাত্রী। স্কুলের পরে সে খবরের কাগজ ফিরি করত। দু'দিন আগে ও কাঁদতে কাঁদতে আমার বাড়ীতে এসেছিল এই বলতে যে শীগগিরই ত্রোইর প্রাণদণ্ড হবে। আমি অবাক হয়ে ভাবলুম এখন সে কোথায়! হয়তো সে এখন শহরের কোন এক জায়গায় খবরের কাগজ ফিরি করছে, আর ত্রোইর সম্বন্ধে সুখবরটা হেঁকে হেঁকে গলা ভেঙ্গে ফেলেছে।

ব্যাচ তুয়েত কটন-উল কারখানা, যেখানে আমি কাজ করতুম তার প্রতিটি বিভাগে—ধোয়া, শুকনো করা, কাটা, এবং প্যাক করা বিভাগগুলোতে এবং অফিসে—সবাই আমাকে ঠাট্টা করতে লাগল: 'তোমার স্বামী মুক্তি পেলে ম্যাকনামারার, কিন্তু আতংক হবে।' বা 'সারা সায়গনই তোমার স্বামীর কথা বলাবলি করছে। বেশ সম্মানের কথা, তাই মনে হয় না তোমার?' কয়েকজন তরুণ খুব উৎসাহের সঙ্গে আলোচনা করছিল খুব শীগগিরই কি ঘটবে বলে তারা মনে করে, তাই নিয়ে।

'ঐ আমেরিকান কর্ণেলটার সঙ্গে কুয়েনের স্বামীর বিনিময় নিশ্চয়ই সায়গনে

হবে না—জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট কিছুতেই তাতে রাজী হবে না। আবার তা মুক্ত অঞ্চলেও হতে পারে না। বিনিময়টা কোন নিরপেক্ষ দেশেই হতে হবে।'

'বিনিময়ের পরে ত্রোই উত্তরে চলে যেতে বাধ্য। আর গেলে ওর বউকেও অবশ্যই সঙ্গে নিয়ে যাবে ও।'

'ওর বউ কি যেতে পারবে?'

'কেন পারবে না? জাতীয় মুক্তিফ্রণ্ট তাকে নিয়ে যাবার জন্যে কাউকে পাঠিয়ে দেবে।'

'স্বামীর সঙ্গে থাকার অধিকার একজন স্ত্রীর অবশ্যই আছে। ওরা দু'জনে বোধহয় একসঙ্গেই যাবে।'

'বলুন, কুয়েন দিদি, আপনার সাহস হবে তো?'

এই কথা শুনে আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলুম, কিন্তু আমি নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করলুম।

'এখন এইসব খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার কি?' উত্তর দিলুম আমি। 'কি যে ঘটতে যাচ্ছে তা তো এখনও আমরা সঠিক জানি না।'

'কিন্তু এ তো দিনের আলোর মতই পরিষ্কার। খবরের কাগজেই বলছে যে যদি ত্রোইর প্রাণদণ্ড হয় তা হলে আমেরিকান কর্ণেলটাকেও সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে মারা হবে।'

দুপুরে কাজের বিরতির সময় একজন নারী কর্মী কিছুটা নিজের মনেই বলে উঠল।

'কি দুঃখের কথা! ছোট্ট কুয়েনটা শীগগিরই আমাদের কারখানা ছেড়ে চলে যাবে। বিনিময়টা যেখানেই হোক না কেন সেইখানেই ও ওর বরের সঙ্গে চলে যাবে।'

আমার এক বন্ধু একটু ঈর্ষার আমেজ মিশিয়েই যোগ করলে,

'কি ভাগ্যবতী মেয়ে তুই! দু'দিন বাদেই উত্তরে পাড়ি দিতে পারবি।'

সকলেই ঐরকম একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ছবি আঁকছিল! মাত্র একদিন আগে ঠিক এই সময়ে, আমি উকিলের অফিসে বসে কি করে আমার স্বামীর প্রাণদণ্ড স্থগিত রাখা যায় তারই ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছিলুম। আর এখন আমার মন, যা কখনও কল্পনাও করতে পারিনি এরকম একটা রঙীন স্বপ্নে বিভোর: শুধু যে ত্রোইর জীবন রক্ষা পাবে, শুধু যে ও মুক্তি পাবে তাই নয়, ও উত্তরেও পাড়ি দিতে পারবে। ও হো কাকার সঙ্গে দেখা করতে পারবে, তার জীবনের সবচেয়ে প্রিয় সাধ মিটবে।

যখনই ও আমাকে হো-চি-মিনের কথা বলত, তখনই ও বলত: 'যদি আমরা কোনক্রমে একবার উত্তরে যেতে পারি তাহলে তাঁকে একবারটি মাত্র চোখের দেখা দেখার জন্যে তাঁর বাড়ীর কাছে অপেক্ষা করে থাকব।'

তারপর কিছুটা ঈর্ষার সঙ্গে বলত,

'আমাদের স্বদেশবাসী যারা উত্তরে রয়েছে—তারা তাঁকে প্রায়ই দেখতে পান, কিন্তু আমরা একবারও দেখতে পাই না।'

ও যদি এই বিনিময়ের কথা, আর তার চেয়ে বড় কথা, ও যে শীগগিরই উত্তরে চলে যেতে পারবে তার কথা শুনে থাকে, তাহলে ও কতই না খুশী হয়েছে!

এইমাত্র আমি ত্রোইর কাছ থেকে একটা চিঠি পেলুম। আমার হৃদপিণ্ডটার গতি উদ্দাম হয়ে উঠল। সুখবরটা হয়তো ও ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছে! চিঠিটা বেশ ছোটই, ডাকে এসেছে। তাতে লেখা:

চি-হোয়া, ১১ই অক্টোবর, ১৯৬৪

কুয়েন সোনা আমার,

আশা করি তুমি শারীরিক কুশলে আছ। আমার একটু মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে, তার জন্যে ঘুমুতে পারছি না। আর আমার শরীরটাও একটু খারাপ। আমার এক কৌটো মেনথল দেওয়া মলম হলে ভাল হয়। পরের বার আসার সময় এক কৌটো নিয়ে এসো।

আমার জন্যে দুর্ভাবনা কোরো না। আমাদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের আমার শ্রদ্ধা ও প্রীতি জানিও। তাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা সাক্ষাৎ কোরো, আর তোমার দুঃখকষ্ট ভুলে থাকার চেষ্টা কোরো।

তোমাকে আমি যা বলেছিলুম মনে আছে তো?

—তোমার ত্রোই

খামের ভিতরে আর একটা চিঠি ছিল।—

প্রিয় লোই,

শুনলুম তুমি এসে কুয়েনের সঙ্গে রয়েছ। যখনই দেখবে ও কান্নাকাটি করছে তখনই ওকে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা কোরো। যাতে ও হাসিখুশী থাকে তার জন্যে ভেবে চিন্তে ওকে মজার কথাটথা শুনিও। অসংখ্য ধন্যবাদ।

—ত্রোই

আর একটা কাগজে ও আমার মা-বাবাকে, ওর ভাইপো হুয়াকে, বে দাদা যিনি আমাদের সঙ্গে একই বাড়ীতে থাকতেন, তাঁকে আর কয়েকজন প্রতিবেশীকে ছোট

ছোট চিঠি লিখেছে। তাতে ও তাঁদের প্রতি ওর শ্রদ্ধা জানিয়েছে আর আমার দেখাশোনা করার জন্যে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছে।

এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে ও ভেনেজুয়েলার ব্যাপারটা কিছুই জানে না। বরং ও ধরে নিয়েছে যে পরের সপ্তাহেই ওর প্রাণদণ্ড কার্যকর করা হবে। কিন্তু চিঠিতে ও সে কথাটা সযত্নে এড়িয়ে গেছে। এতে করে আমার উৎকণ্ঠাই আরো বেড়ে গেল। কারণ, এ কদিন ধরে আমি আশা করার মত আরও অনেক হেতুই পাচ্ছিলাম। যে আমেরিকান দূতাবাস আগে আমার স্বামীর প্রাণদণ্ড কার্যকর করার জন্যে খানকে হুকুম দিয়েছিল, সে-ই এখন হুকুম দিয়েছে যে প্রাণদণ্ড স্থগিত থাকবে। সায়গনের সংবাদপত্রগুলো এখন ত্রোই সংক্রান্ত খবরের জন্যে আগের চেয়েও বেশী জায়গা দিচ্ছে। ওর নাম কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় এত বড়বড় হরফে ছাপা হচ্ছে যে প্রায়ই তা কাগজের নিজের নামকেই ছাড়িয়ে যাচ্ছে। খবরের কাগজ বিক্রির কোন কোন স্টল থেকে লাউডস্পীকারের চীৎকার শোনা যাচ্ছে :

'দুইটি জীবনের বিনিময়, ইতিহাসে যার কোন নজির নেই। আমেরিকান দূতাবাস কর্তৃপক্ষের কাজে হস্তক্ষেপ করেছে……'

শুভ সংবাদটা আমার স্বামীকে জানাবার জন্যে আমি একটা চিঠি লিখলুম,- পরের দিন ওর সঙ্গে দেখা করার দিন—খাবারদাবারের ঠোঙা আর ওষুধপত্রের সঙ্গে নিয়ে গিয়ে ওকে সেটা দেব। আমি ওর নতুন স্যুটটা বাতাসে মেলে দিলুম, আর তারপর ব্রাশ দিয়ে ঝেড়ে পরিষ্কার করলুম। ওর প্রিয়জনদের খুশী করবার জন্যে টাকা ধার করে, জীবনে একবারই ও নিজের জন্যে ছাইরঙের একটা পশ্চিমী ঢঙের স্যুট কিনেছিল। আমাদের বিয়ের দিন মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্যে ও এটা পরেছিল। যেদিন ও জেল থেকে ছাড়া পাবে সেদিন নিশ্চয়ই এটা আবার পরবে।

১৫ই অক্টোবর সকাল বেলা, আমি চি হোয়া জেলখানায় গেলুম। জেলখানার ফটকের ওপরে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত এক বিরাট ব্যানার টাঙান। তাতে লেখা : 'সারা পুনর্শিক্ষণ কেন্দ্র জাতীয় উচ্চ পরিষদকে স্বাগত জানাচ্ছে।' অস্বাভাবিক কিছু একটা নিশ্চয়ই ঘটতে চলেছে : মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামীদের ব্লক পর্যন্ত সারা রাস্তাটার ধারে সশস্ত্র পুলিশ সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি অনুমান করলুম যে জাতীয় উচ্চ পরিষদের সভ্যরা যারা পরিদর্শনে আসছেন তাদের —গার্ড অফ অনার দেবার জন্যে ওরা দাঁড়িয়ে আছে। আমি নিঃশব্দে দুইসারি সশস্ত্র পুলিশের মধ্যে দিয়ে হেঁটে অফিসের দিকে গেলুম।

সেদিন আমার মন যে রকম প্রশান্তিতে ভরে ছিল, যতখানি আশান্বিত হয়ে

উঠেছিল, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে এরকম একজন মেয়ে কোনদিন তার থেকে বেশী প্রশান্তি অনুভব করেনি, বেশী আশান্বিত বোধ করেনি। আমায় যদি ওর সঙ্গে দেখা করতে দেয়, তাহলে কি শুভ সংবাদটাই না ও আমার কাছ থেকে পাবে। ওর সম্বন্ধে খবরের কাগজে যত কিছু লেখা ছাপা হয়েছে তার সব কিছু আমি ওকে শোনাব, সব আমার একেবারে মুখস্থ হয়ে গেছে। ওকে বলব খবরটা শুনে সারা শহরের লোক কিরকম খুশী হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু আমি অপেক্ষা করছি তো অপেক্ষাই করছি। এক ঘণ্টারও বেশী সময় পার হয়ে যাবার পর একটা পুলিশ আমার কাছে এসে বললে :

'আজকে সব অতিথিরা আসবে। আজ একটা বিশেষ ব্যাপার আছে। তাই, আজ বন্দীদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ বাতিল করা হয়েছে। আর কোন ঠোঙা টোঙা নেবারও হুকুম নেই। এখন যাও, পরে এক সময় এসো।'

আমি আমার মোড়কটা নিয়ে আমার স্বামীকে দেবার জন্যে অনেক অনুনয় করলুম, কিন্তু লোকটা রাজী হলো না। বললে, 'তুমি বিকেল বেলা এসো।' তখন সকাল ১০টা। রাস্তার দু'পাশে ১ মিটারের মত দূরে দূরে দু'সার সশস্ত্র পুলিশ পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেই দু'সারের মধ্যে দিয়ে আমি জেলখানার ফটকের কাছে ফিরে এলুম। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত বন্দীদের ব্লকের আঙিনায় একদল সাংবাদিকদের সঙ্গে আমার দেখা হলো, তাদের মধ্যে দক্ষিণ-ভিয়েতনামী, বিদেশী—সব রকমই আছে। তাদের কাঁধে ক্যামেরা ঝোলান রয়েছে, দেখে খুব ব্যস্ত সমস্ত বলে মনে হচ্ছিল। একটা সামরিক গাড়ী ভেতরে ঢুকছিল, তার জন্যে ফটকের কাছে আমাকে একপাশে সরে দাঁড়াতে হলো। গাড়ীটাতে একটা শবাধার ছিল। 'আবার একজন বন্দী মারা গেছে,' ভাবলুম আমি। জেলখানার সীমানার বাইরে হোয়া লুং ষ্ট্রীট বরাবর সশস্ত্র পুলিশরা এখন দল বেঁধে বেঁধে পাহারায় দাঁড়িয়ে আছে। আমি যখন সাইকেল জমারাখার জায়গায় আমার সাইকেলটা বের করে দেবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি, তখন একজন বললে : 'যে লোকটা কং লী সেতুর নাচে মাইন পেতেছিল, ঐ হলো তার বউ। হ্যাঁ ঠিক, ওই সে, কিন্তু ও ফিরে এল কেন?'

সেখানকার লোকজন সব আমাকে ভাল করেই চিনত। মাসের পর মাস যখন আমি আমার স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। তখন প্রায়শই আমি হয় জেলখানার সামনে অপেক্ষা করেছি, আর নয় ওদের দোকান পাতি থেকে খাবার দাবার বা অন্যান্য জিনিস কিনেছি। আমার প্রতি ওদের গভীর সহানুভূতি ছিল আর

ত্রোইর প্রতি ছিল গভীর ভালোবাসা। ওরা সব সময়ই আমাকে সবচেয়ে টাটকা ফল, সবচেয়ে টাটকা কেক দিত। কেউ কেউ বলত, 'তোমাদের মত লোকের কাছ থেকে আমরা লাভ করার কথা ভাবতেই পারি না। তোমার কাছে আমরা কেনা দামেই বিক্রি করছি।'

আমি ফিরতেই একজন বয়স্কা মহিলা হাতের ইসারায় আমাকে কাছে ডাকলেন, সারা মুখে তাঁর বেদনার ছাপ। তিনি বললেন:

'তুমি ফিরে এলে কেন? ওরা তোমার স্বামীকে যে এক্ষুণি প্রাণদণ্ড দেবে। তুমি দাবী করলে না কেন যে তোমাকে দেখা করতে দিতেই হবে।'

আমি আমার কানকে বিশ্বাস করতে পারলুম না। না, এ অসম্ভব!

"একথা সত্যি হতেই পারে না।" আমি বলে উঠলুম, "আমি এক্ষুণি ওখান থেকে আসছি, ওরা বললে যে আমি আজ বিকালেই ওর জন্যে খাবার নিয়ে আসতে পারব। তাছাড়া, প্রাণদণ্ড স্থগিত রাখা হয়েছে। কাগজেই সে কথা বেরিয়েছে।"

'আমরা সকলেই জানি তা কাগজে বেরিয়েছে। আজ সকাল পর্যন্ত আমরা তোমার আনন্দের অংশীদার ছিলুম। যত বছর ধরে আমরা জেলখানার সামনে জিনিসপত্র বিক্রি করছি, তার মধ্যে এই প্রথমবার এই রকম একটা জীবন বিনিময় হতে যাচ্ছিল। কিন্তু ওরা ওদের কথা রাখেনি। যদিও সেই বহু দূরের দেশটাতে আমেরিকানটাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, তবুও তোমার স্বামীর প্রাণদণ্ড হতে যাচ্ছে। সশস্ত্র পুলিশগুলো বলছিল যে যে-লোকটা কং লী সেতুর নীচে মাইন পেতেছিল তাকে আজ গুলি করে মারা হবে।'

"আমি হতবুদ্ধির মত সেখানে দাঁড়িয়ে রইলুম, ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারছিলুম না। মহিলাটি তখন আমাকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে কান্না ধরা গলায় বললেন: 'ওরা মিথ্যে কথা বলেনি। ওরা আজ সকালেই তোমার স্বামীকে প্রাণদণ্ড দিতে যাচ্ছে। ওকে গুলি করে মারবে। শবাধারটাও নিয়ে আসা হয়ে গেছে। সাংবাদিক আর ক্যামেরাম্যেনরাও এসে গেছে। যাও, মা, তাড়াতাড়ি ফিরে যাও। আমার পরিচিত একজন সশস্ত্র পুলিশ আমাকে সমস্ত কিছুই বলেছে।'

তাহলে একথা সত্যি! ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে আমি ছুটে গেলুম জেলখানার ফটকের দিকে, লোহার দরজাগুলো এঁটে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কয়েকজন সশস্ত্র পুলিশ আমাকে টেনে সরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলে, কিন্তু আমি ওদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করতে লাগলুম আর চীৎকার করে বলতে লাগলুম:

"তোমরা আমার স্বামীকে কিছুতেই খুন করতে পারবে না! তোমরা কিছুতেই

ওকে খুন করতে পারবে না ; সে অধিকার তোমাদের নেই । ওর সঙ্গে দেখা করার জন্যে আমাকে তোমাদের ঢুকতে দিতেই হবে।" কিন্তু একজন সশস্ত্র পুলিশ আমার হাতটা পিছন দিকে মুচড়ে ধরে বলে উঠল, 'কারোরই ভেতরে ঢোকার হুকুম নেই। তোমাকে পাসের জন্যে দরখাস্ত করতে হবে।'

তারপর ওরা আমাকে টেনে হিঁচড়ে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল, আর একদল সশস্ত্র পুলিশ এসে জেলখানার ফটকের পথটা আড়াল করে দাঁড়াল। মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্তদের ব্লকের দিকে ফিরে আমি যত জোরে পারি আমার স্বামীর নাম ধরে চীৎকার করে ডাকতে লাগলুম। 'হয়তো ঠিক এই মুহূর্তেই ওরা ওকে বধ্যভূমির দিকে নিয়ে যাচ্ছে—' এই চিন্তাটা আমাকে পাগল করে দিলে। সশস্ত্র পুলিশগুলো ধাক্কা দিয়ে আমাকে ফটকের কাছ থেকে সরিয়ে দিলে। শেষ পর্যন্ত আমি ছুটে গেলুম সাইকেল রাখবার জায়গায়, সেখানে থেকে সাইকেলটা নিয়ে প্রাণপণ বেগে বাড়ীর দিকে ছুটলুম। এখন আমি কি করতে পারি সে সম্বন্ধে বাবার সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। কয়েকজন আমাকে থামিয়ে জিগ্যেস করল :

'তুমি ফিরে এলে কেন ? ওরা কি তোমাকে ঢুকতে দিতে রাজী হলো না ?'

"ওরা আমাকে ঢুকতে দিলে না। আমি ওদের অনেক অনুনয় বিনয় করলুম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। ওরা ফটকটা আগলে রেখেছে। আমি এখন বাড়ী যাচ্ছি বাবার সঙ্গে দেখা করার জন্যে।"

প্রচণ্ড রাগে অধীর হয়ে লোকগুলো শাসন কর্তৃপক্ষকে গালাগাল করতে লাগল :

'জংলী বর্বর কোথাকার ! একজনকে খুন করতে যাচ্ছে, তবু তার আগে শেষবারের মত তার সঙ্গে তার বউকে দেখা করতে দেবে না ! কি অমানুষিক বর্বরতা।'

কোয়াংনাম থেকে ত্রোইর বাবা এসেছিলেন। তিনিও এই জীবন-বিনিময়ের কথা শুনেছেন, আর এখন শেষ ফলাফলের জন্যে পরম আশা ভরে অপেক্ষা করছিলেন। যে খবরটা আমি নিয়ে এলুম সেটা তাঁর এবং আমার বাবার দু'জনের কাছেই বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত মনে হলো। একটুও বিলম্ব না করে আমরা তিনজনে আবার আমাদের উকিলের সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। তিনি তো বিশ্বাসই করতে চাইলেন না। 'অসম্ভব' তিনি বললেন : 'প্রাণদণ্ড স্থগিত রাখার জন্যে একটা আদেশ দেওয়া হয়েছে। তার যদি কোন অদলবদল করা হোত, তাহলে ওরা আমাকে তো জানাত—আমি ওর পক্ষের কৌঁসুলি। যার প্রাণদণ্ড হচ্ছে সে নিশ্চয়ই অন্য কেউ।'

'জেলখানার আশে পাশে যারা থাকে তারাই বললে, যে লোকটা কিং লী সেতু

উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল তারই মৃত্যুদণ্ড হচ্ছে,' আমি বললুম, 'দয়া করে আপনি একবার খোঁজ নিন যাতে আমাদের মনটা শান্ত হয় ।'

উকীল মশাই ইতস্তত করতে লাগলেন। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে আমার কথা তাঁর বিশ্বাস হয়নি। অবশেষে তিনি জেল অফিসে টেলিফোন করলেন। হঠাৎ তাঁর মুখের ভাব বদলে গেল। 'তাই নাকি? তাই নাকি?' হতবুদ্ধি হয়ে তিনি বিড়বিড় করতে লাগলেন, তারপর আস্তে আস্তে রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন।

'এই মাত্র ওকে গুলি করে মারা হয়েছে, ১১টার সময়। এখন ওর মৃতদেহটা দাবী করা ছাড়া আর কিছু আমাদের করার নেই।'

আমার পা দু'টো অবশ হয়ে গেল, প্রাণহীনের মত আমি ধপ করে পড়ে গেলুম চেয়ারের মধ্যে, আর হুমড়ি খেয়ে পড়লুম উকিল মশাইর টেবিলের ওপর। কিন্তু আমার সমস্ত অনুভূতি অসাড় হয়ে গিয়েছিল, এক ফোঁটাও কান্না বেরুল না আমার মুখ দিয়ে। আমার বাবা ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'এখন ওর মৃতদেহটা ফেরত পাবার চেষ্টা করতে হবে, আর তা করতে হবে আমাদেরই, এর জন্যে অন্য কারোর ওপর ভরসা করা যাবে না।'

একটা ট্যাক্সী নিয়ে আমি সারা শহর চষে বেড়াতে লাগলুম। প্রতিটা থানা, প্রতিটা আদালতে খোঁজ নিতে লাগলুম আমার স্বামীর মৃতদেহটা খুঁজে বের করার জন্যে। কিন্তু ওরা আমার কথায় কর্ণপাতই করলে না, আর না হয় ভুল পথ দেখিয়ে দিলে। আমি একটার পর একটা সমাধি ক্ষেত্রে খোঁজ করে ফিরতে লাগলুম, এক বার এক জায়গায় থামলে পরে ট্যাক্সী চালক অবাক হয়ে জিগ্যেস করলে :

'আপনি এমনি করে একটার পর একটা কবরখানায় দৌড়োদৌড়ি করে বেড়াচ্ছেন কেন?'

'ওরা আমার স্বামীকে খুন করেছে। কিন্তু কোথায় যে তাকে সমাধিস্থ করেছে তা আমি জানি না।'

'কি জন্যে ওরা আপনার স্বামীকে খুন করল?'

আমি চুপ করে রইলুম দেখে ও আবার প্রশ্ন করল।

'ও কং লী সেতুর নীচে একটা মাইন পেতে রেখেছিল।'

'কি বললেন!'

সে এত জোরে চেঁচিয়ে উঠল যে রাস্তার লোকজন পর্যন্ত ব্যাপার কি দেখার জন্যে ফিরে তাকাল। তারপর সে জিগ্যেস করলে :

'তার নাম ত্রোই, তাই না ? ম্যুয়েন ভ্যান ত্রোই ?'

আমি উত্তর দিতে পারলুম না। চোখের জলে আমার চোখ জ্বালা করছিল আর কান্না সামলাবার জন্যে আমি শক্ত করে ঠোঁট কামড়ে ধরেছিলুম। চালকটি বারবার আমার স্বামীর নাম উচ্চারণ করতে লাগল, যেন ওরা দু'জন ছিল অনেক দিনের পুরনো বন্ধু। ওর মুখ লাল হয়ে গিয়েছিল। একটু পরে নিশ্চিত হবার জন্যে ও আর একবার জিগ্যেস করবে বলে মনস্থ করল।

'আপনার স্বামীই না সেই ম্যুয়েন ভ্যান ত্রোই, যে আমেরিকান প্রতিরক্ষা সচিব ম্যাকনামারাকে খতম করার চেষ্টা করার মত সাহস দেখিয়েছিল ?'

আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালুম।

সে পেছনের দিকে হাত বাড়িয়ে একটা খবরের কাগজ টেনে বের করে আমার হাতে গুঁজে দিলে।

'কাগজে বলছে যে ওর প্রাণদণ্ড স্থগিত রাখা হয়েছে। অথচ ওরা ওকে হত্যা করল !'

আমি কাগজটার দিকে তাকাতে পারছিলুম না, ওটার দিকে দৃষ্টি পড়লেই আমার সমস্ত হৃদয় চুরমার হয়ে যাচ্ছিল।"

"এ ছাড়া যদি আর কোন সমাধিভূমি থাকে তবে অনুগ্রহ করে আমাকে সেখানে নিয়ে চলুন।"

দড়াম করে ট্যাক্সীর দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে চালক প্রচণ্ড গতিতে ট্যাক্সী চালিয়ে দিলে। সেদিন বিকেলবেলায় আমরা কত মাইল পথ যে চষে বেড়িয়েছি সে সম্বন্ধে আমার কোন ধারণাই ছিল না। আমার মাথা রীতিমত ঘুরছিল। শেষে থ্যাংক বাজারের কাছে গাড়ী রাখবার জায়গায় পৌছলে চালকটি গাড়ী থামিয়ে তার কয়েকজন বন্ধুকে ডাকল, ডেকে বললে, 'ম্যুয়েন ভ্যান ত্রোইকে ওরা আজ সকালে খুন করেছে।'

তারা ওর কথা বিশ্বাস করল না।

'যাঃ, এ হতেই পারে না। আমেরিকান দূতাবাস শাসন কর্তৃপক্ষকে প্রাণদণ্ড স্থগিত রাখার জন্যে আদেশ দিয়েছে।'

চালকটি আমার দিকে দেখাল।

'উনি ত্রোইর স্ত্রী, তার মৃতদেহ খুঁজে বেড়াচ্ছেন।'

ওরা সবাই আমার দিকে ফিরল, তারপর জিগ্যেস করল :

'ওরা তাকে আজ সকালে হত্যা করেছে, একথা সত্যি ?'

'হ্যাঁ।'

ওরা হতবুদ্ধি হয়ে গেল, আমাদের ট্যাক্সীটা প্রচণ্ড গতিতে গিয়াদিনের দিকে ছুটে চলল। কিন্তু বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে গেল তবুও আমরা ত্রোইকে কোথায় সমাধিস্থ করেছে তার সন্ধান পেলুম না। অবশেষে আমরা আমার বাসার কাছে ফিরে এলুম। আমার বাসার দিকে যাবার পথের মোড়ে গাড়ীটা থামিয়ে চালকটি ক্লান্তি আর ব্যর্থতা মাখা মূর্তি নিয়ে নিজের আসনে গুম হয়ে বসে রইল। তার সারা মুখ বেয়ে ঘাম ঝরছে। তার ছাইরঙের শার্টটা ঘামে ভিজে সপসপ করছে। অনেকক্ষণ পরে ও গাড়ী থেকে নেমে এল।

'আজ সন্ধ্যেবেলাতেই আমি আরও কয়েক জায়গায় খোঁজ করব। যদি আমি কিছু খোঁজখবর পাই তাহলে এসে আপনাকে জানিয়ে যাব।'

আমি ওকে ওর ভাড়ার টাকাটা দিলুম। গুণে দেখে ও বেশিটা আমাকে ফেরৎ দিলে, 'আমার বউ ছেলে-মেয়েদের আজকের মত খাওয়াবার জন্যে যে কটা টাকা লাগবে আমি শুধু সেই ক'টা টাকাই নেব। আপনি কালকের ভাড়ার জন্যে এই টাকা ক'টা রেখে দিন। বলা তো যায় না, যদি কালকেও আপনাকে খোঁজ করতে বেরোতে হয়।'

কিন্তু পরের দিন আমি খবরের কাগজ থেকে জানতে পারলুম যে শাসন কর্তৃপক্ষ আমার স্বামীকে মিউনিসিপ্যাল সমাধিক্ষেত্রে সমাধিস্থ করেছে। ওর নাম লেখা একটা ছোট্ট সমাধিফলক নিয়ে আমাদের পরিবারের সকলে সেখানে গেলুম, গিয়ে ফলকটা ওর সমাধির সামনে বসিয়ে দিলুম। সমাধিভূমিতেও পুলিশ আমাদের অপেক্ষায় ছিল। তারা আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপের ওপর নজর রাখছিল আর আমাদের প্রত্যেকের ফটোও তুলে নিল ওরা।

আমাদের পরিবারের মধ্যে আমার মা-ই সবচেয়ে শেষে খবরটা জানতে পারলেন। তিনি বিয়েন হোয়ার বিন সেং-এ জিনিসপত্র ফিরি করতে গিয়েছিলেন। পরের বার জেলখানায় দেখা করতে যাবার সময় নিয়ে যাবে বলে উনি ফেরার পথে মাংস আর ফল কিনে নিয়ে এসেছিলেন। বাড়ীর দরজায় আমার ছোট বোন ক্যান তাঁকে ঐ সাংঘাতিক খবরটা দিয়ে অভ্যর্থনা জানাল। ও বললে :

'মা মণি, ওরা তু দাদাকে গুলি করে মেরে ফেলেছে।'

দুঃখে মা আধপাগলের মত হয়ে গেলেন। মাটির ওপর ভেঙে পড়ে তিনি চীৎকার করে বিলাপ করতে লাগলেন, কাঁদতে লাগলেন আকুল হয়ে আর অন্তরের সমস্ত ঘৃণা উজাড় করে দিয়ে আমেরিকান আগ্রাসক আর থানচক্রকে শাপ-

শাপান্ত করতে লাগলেন। পাড়াপড়শীরা সব ছুটে এল। যে সব পুলিশ গুপ্ত আমাদের পরিবারের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছিল, তারা সব দরজার কাছে এসে উঁকি মারতে লাগল। আমার বাবা উৎকণ্ঠীত হয়ে পড়লেন। তিনি মাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

'অত হৈ-চৈ কোরো না। তোমার যে কত কষ্ট হচ্ছে তা বুঝতে পারছি। কিন্তু একটু শান্ত হবার চেষ্টা কর।'

কিন্তু আমার মা তাঁর কথা শুনতে চাইলেন না। তিনি বললেন,

'ওর শোকে তুমি কেমন করে কাঁদবে সে তুমি জান। আমি জানি আমি কেমন করে কাঁদব। আমার বুকভাঙা বেদনার ভার হাল্কা করবার জন্যে আমি চীৎকার করে কাঁদবোই। যে অমানুষিক বর্বরতা ওকে খুন করেছে তাদের আমি প্রাণভরে শাপান্ত করছি। ওরা আসুক, এসে আমাকে খুন করুক। ভয় করি না আমি ওদের। আহা, কি সোনার চাঁদ জামাই আমার! পৃথিবীতে ওর জুড়ি আর কে আছে?'

দুঃখে ঘৃণায় তিনি পাগলের মত হয়ে গেলেন।

খান হোই থেকে তিনি ফু মুয়ানে আমার বাড়ীতে ছুটে এলেন।

ত্রোইর ছবিতে তাঁর দৃষ্টি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আবার কান্নায় ভেঙে পড়লেন। বাড়ীর যে অংশে বে মশায় থাকতেন সেখানে পুতুল সরকারের তিনটে রেখাটানা পতাকাটা ঝুলছিল। তিনি সেটাকে টেনে নামিয়ে টুকরো টুকরো করে পা দিয়ে মাড়াতে লাগলেন।

উত্তরের রীতি অনুসারে আমার মা আমার স্বামীর জন্যে খান হোই প্যাগোডায় সাতসপ্তাহব্যাপী এক শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের আয়োজন করলেন।

প্রথম সপ্তাহের শুরুতে, সন্ন্যাসীরা প্যাগোডার সদর দরজার বাইরে কালো বোর্ডের ওপর এই বিজ্ঞপ্তিটা দিলেন:

> "২২শে অক্টোবর, ১৯৬৪, সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায়, নুয়েন ভ্যান ত্রোইর আত্মার শান্তির জন্য এই প্যাগোডায় এক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। সকল বুদ্ধ-বিশ্বাসীরা যোগদান করুন।"

অনুষ্ঠান শুরু হবার অনেকক্ষণ আগে থেকেই নিরাপত্তা বাহিনীর চররা সদর দরজার ওপর নজর রাখতে শুরু করেছিল। আমার ভয় হয়েছিল যে ওদের ভয়ে কেউই অনুষ্ঠানে আসতে সাহস করবে না। কিন্তু দেখলুম যে অন্যান্য যে সব শ্রাদ্ধানুষ্ঠান আমি দেখেছি তাদের অনেকের থেকে এখানে বেশী লোক সমাগম

হলো। সবাই সঙ্গে নিয়ে এল গন্ধ ধূপ আর ফুল। প্যাগোডার এই অনুষ্ঠান আমার প্রাণে পরম সান্ত্বনা এনে দিল। ত্রোইর মৃত্যুর দিন থেকে আজ পর্যন্ত সায়গনের জনগণ তার হত্যাকারী খান-চক্রকে ধিক্কার দিয়ে আর তার সাহসের প্রশংসা করে বহু ইস্তাহার বিলি করেছে। একজন লরীচালক, আমি যে কারখানায় কাজ করতুম সেও সেই কারখানায় তুলো নিয়ে আসতো, সে আমাকে বললে— যে রাস্তায় দিনে রাত্তিরে সবসময় অসংখ্য গাড়ী ঘোড়া চলাচল করছে, সেই বিয়েন হোয়া রাজপথের ঠিক বুকের ওপর একটা ব্যানার টাঙান হয়েছে ; তাতে লেখা : নুয়েন ভ্যান ত্রোইর বিপ্লবী চেতনা দীর্ঘজীবী হোক ! অনেক হোটেল রেঁস্তোরাই ১৬ই অক্টোবর, ১৯১৬, তারিখের খবরের কাগজ—যাতে প্রাণদণ্ডের ছবিগুলো ছিল, সেগুলো রেখে দিয়েছিল, যাতে তাদের খরিদ্দাররা ইচ্ছে হলেই সেগুলো দেখতে পারে। ১৬ অক্টোবর সকালে বেন থ্যান বাজারে এমন একটা শোকাকুল আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছিল যে বেচাকেনা একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমার ধাই মা, শ্রীমতী 'ম' পরে আমাকে বলেছিলেন যে বাজারের পুলিশ সুপারিন্টেন্-ডেণ্টটা অবাক হয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল : 'ভিয়েতকংটার জন্যে সবাই এমন করে কেঁদে মরছে কেন ?'

সেদিন সন্ধ্যেবেলা পুলিশের উপস্থিতিকে অগ্রাহ্য করে দলে দলে লোক এসে প্যাগোডাতে হাজির হতে লাগল। আমাকে শোকের পোশাকে দেখে তারা আমার কাছে এগিয়ে এল আর আমাকে নানা প্রশ্ন করতে লাগল : কতদিন আমাদের বিয়ে হয়েছিল ? আমি কি কাজ করতুম ? ত্রোইর নিজের গ্রাম ছিল কোথায় ? ইত্যাদি। একজন বয়স্কা মহিলা আমাকে জিগ্যেস করলেন, 'এই অসম সাহসী ছেলেটার বাপ-মা কি ধরণের লোক ছিলেন বল তো ?' তারপর বেদনা মাখা স্বরে আমাকে বললেন, "তোমার স্বামী দেশের জন্যে প্রাণ উৎসর্গ করেছে। তার এই আত্মোৎসর্গে তুমি অশেষ দুঃখ পাচ্ছ। পুলিশগুলো যদি সদাসর্বদা তোমার ওপর নজর না রাখতো, তা হলে আমি তোমাকে আমার সঙ্গে আমাদের বাড়ীতে যেতে বলতুম। আশা করি তুমি বুঝতে পারছ।"

'আপনার অশেষ দয়া যে আপনি এই শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে এসেছেন।' আমি বললুম। 'আমার ভয় ছিল যে পুলিশের ভয়ে কেউ আসতে সাহস পাবে না।'

'সে কথা একেবারে মিথ্যে নয়, কেউ কেউ ভয় পেয়েছে। তারা বাড়ীতে বসে তোমার স্বামীর জন্যে প্রার্থনা করছে। কিন্তু আমি আর আমার বন্ধুবান্ধব মিলে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলুম : 'সে বধ্যভূমিতেও ঐরকম অসাধারণ সাহস দেখিয়েছে, আর আমরা শুধু একটা শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে যেতে ভয় পাব ?'

ভগিনী 'ক'ও অনুষ্ঠানে এসেছিল। মাত্র অল্প কয়েকদিন আগেই ও আহ্লাদভরে আমায় বলেছিল: 'ত্রোই ছাড়া পেলে পরে তার জন্যে আনন্দ করে যে ভোজ দেবে তাতে আমাকে নেমন্তন্ন করতে ভুলো না যেন।'

এখন সে আমায় বললে, 'রাতের খাওয়া দাওয়া শেষ হবার আগে পর্যন্ত আমি এই শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের কথা জানতে পারিনি, আর তাই ধূপ বা ফুল কিছুই জোগাড় করার সময় পাইনি।' তারপর জিগ্যেস করলে, 'তুমি কি মুক্তিফ্রণ্টের বেতার (Radio Liberation) আর হ্যানয় বেতার শুনেছ?'

'আমার তো কোন রেডিও নেই। আর যদি থাকত তাহলেও পুলিশের জন্যে আমি ঐ কেন্দ্র গুলো শুনতে পারতুম না।'

'তারা ঘোষণা করেছে যে ত্রোইকে 'দক্ষিণ ভিয়েতনামের বীর' এই উপাধি এবং 'পিতৃভূমির ব্রোঞ্জ দুর্গ' দুই পদকে ভূষিত করা হয়েছে। দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে এই যে প্রতিরোধ যুদ্ধ চলেছে, এর মধ্যে দক্ষিণের আর কেউই এরকম সম্মানের অধিকারী হয় নি। এটা নিশ্চয়ই তোমার কাছে একটা পরম সান্ত্বনার বিষয়।'

'শহরের জনগণের কাছে বিলি করা একটা পুস্তিকা আমি দেখেছি: তাতে তার জীবনী, তার কার্যাবলী আর তুমি এক্ষুণি যে সম্মান সূচক উপাধি গুলোর কথা বললে সেগুলোর কথা বলা হয়েছে।'

প্যাগোডার চত্বরের এক কোণে আমাকে ঘিরে একটা ভিড় জমে গিয়েছিল। শাসক কর্তৃপক্ষ কিভাবে আমার স্বামীর প্রাণদণ্ড কার্যকর করার আগে আমাকে শেষবারের মত একবার তার সঙ্গে দেখা করতে দেয়নি, কিভাবে তারা তার মৃত দেহটা পর্যন্ত আমাকে দিতে অস্বীকার করেছিল—এসব কথা আমি তাদের শোনালুম। প্রাণদণ্ডের বিশদ বিবরণ খবরের কাগজে বেরিয়েছে, কিন্তু আমার স্বামী আর তার পরিবার পরিজন কী বর্বর ব্যবহার পেয়েছে—তা এখনই মাত্র তারা শুনতে পেল। আমার চারপাশেই আমি বেদনা আর বিস্ময় মেশানো উক্তি শুনতে পেলুম। অনেকেই ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ফটকের দিকে চলে গেল।

অনুষ্ঠানের চতুর্থ সপ্তাহে আমি কোয়াংনামে ত্রোইর জন্মস্থানের দিকে যাত্রা করলুম। আমার স্বামীর নিজের গ্রামে এই আমার প্রথমবার যাওয়া। যাবার আগে আমি সবাইকে বলতুম, 'যদি কোন কারণে আমি ঠিক সময় মত ফিরতে না পারি তাহলে পরবর্তী সপ্তাহগুলোর অনুষ্ঠানটা আপনারা একটু দেখবেন।'

'তোমার যতদিন খুশী তুমি সেখানে থেকো,' ওরা বললে। ত্রোই আমাদের জন্যে, তার দেশবাসীদের জন্যে, তার নিজের জীবন বলি দিয়েছে। তাই আমাদেরই

কর্তব্য হলো তার সমস্ত ব্যাপার দেখাশোনা করা! এই শ্রাদ্ধানুষ্ঠানটা আমাদের সকলের ব্যাপার। তবে তুমি আমাদের জন্যে শুধু একটা কাজ কোরো: ফেরার সময় প্যাগোডাতে তুমি ওর একটা ছবি নিয়ে এসো। প্রতি মাসের ১লা আর ১৫ই তারিখে আমরা এসে তাতে ফুল দেব আর ধূপ জ্বালাব।'

শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের শেষ সপ্তাহ শুরু হবার আগে ঠিক সময়মত আমি সায়গনে ফিরে এলুম। আগের থেকেও বেশী লোক তাতে যোগদান করল। ত্রোইর গ্রামে আমি কি রকম বেড়ালুম, কি দেখলুম সে সম্বন্ধে তারা আমাকে অনেক কথা জিগ্যেস করলে। মুক্তিবাহিনীর ক্যাডাররা (Liberation Cadres) কেমন করে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, আর তারা আমাকে কি বলেছিল—এসব কথা আমি সংক্ষেপে তাদের বললুম। ক্যাডাররা আমাকে বলেছিল যে ত্রোইর হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্যে তারা বহু শত্রুকে খতম করেছে। তারা আরও বলেছিল যে তারা শপথ নিয়েছে যে ত্রোইর এই সাহসিকতা থেকে তারা জীবনে শিক্ষা গ্রহণ করবে। ত্রোইর প্রশস্তিতে গানও রচনা করেছে তারা, আর আমাদের, তার পরিচয়-পরিজনদের বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়েছে বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করার জন্যে আর তার, একজন জাতীয় বীরের—যাকে জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করেছে—তার যোগ্য হবার জন্যে।

একদিন যখন বেশ রাতে প্যাগোডা থেকে বেরলুম তখন একটা ছোট্ট মেয়ে এসে আমাকে ভগিনী 'জ'-এর একটা চিঠি দিয়ে গেল। চিঠিটা পেয়ে আমার খুব আনন্দ হলো। তাহলে জেলখানা থেকে পালাবার পর থেকে ও সায়গনেই রয়েছে। ওর সাহায্য চাইব বলে ওর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আমি অধীর হয়ে উঠেছিলুম।

বাড়ীতে ফিরেই আমি সতর্কতার সঙ্গে দরজাটা বন্ধ করে দিলুম, আর তারপর আলোটা জ্বালিয়ে চিঠিটা পড়তে শুরু করে দিলুম:

'আমি গিয়ে তোমার দুঃখের ভাগ নিতে পারিনি। কিন্তু আমি নিশ্চিত জানি যে তোমার হৃদয় শুধু বেদনাতেই নয়, তোমার স্বামীর জন্যে গর্বেও ভরে আছে। আমাদের সকলের পক্ষেই সেই কথা: আমাদের এই কমরেড, যার আত্মোৎসর্গ সারা দেশের, তথা সারা বিশ্বের শ্রদ্ধা অর্জন করেছে, তার জন্যে আমাদের অন্তর অসীম গর্বে ভরে উঠেছে।

"গত রাত্রে আমরা স্থানয় বেতার থেকে প্রচারিত একটা কবিতা আবৃত্তি শুনলাম। কবি তে হু যিনি 'আমরা পায়ে পায়ে এগিয়ে চলি' কবিতাটা লিখেছিলেন তিনি তোমার স্বামীকে নিয়ে যে-কবিতাটা লিখেছেন সেটা আবৃত্তি করে শোনালেন।

আমরা সেটা রেকর্ড করে নিতে পারিনি, তবে আমি নিশ্চিত যে শীগ্গিরই আমরা ওর পুরো পাঠটাই পেয়ে যাব। কারণ আমি একজন ছাত্রকে জানি যে তো হুর সব কবিতাই সংগ্রহ করে।"

"লেখক আর কবিরা উচ্চকণ্ঠে ত্রোইর প্রশস্তি রচনা করছেন: 'এক মহাপ্রাণ তরুণ, হো চি মিন যুগের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র।' ও এমন সদর্প সাহসিকতার সঙ্গে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছে যে আমার পরিচিত ছাত্ররা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে চলেছে, 'যদি আমাদের মরতেই হয় তো আমরা ত্রোইর মত করেই মরব।' তাদের নোট বইতে তারা ত্রোইর ফটো এঁটে রেখেছে। একদল ছাত্র তো তার প্রায় একশোটা ফটো সংগ্রহ করেছে; সেগুলোতে ও যে মুহূর্তে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্তদের ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে এল তখন থেকে শুরু করে শেষে যখন ও উচ্চকণ্ঠে তার শেষ কথাগুলো ঘোষণা করছিল, তখন পর্যন্ত ঘটনা গুলো পরপর দেখান হয়েছে।"

"শ্রমিক আর ছাত্রদের কাছে তার জীবন, একজন সাধারণ বিদ্যুৎ কর্মীর জীবন, এক উজ্জ্বল আদর্শ হয়ে উঠেছে। তাদের মধ্যে অনেকেই গুপ্ত সভার ব্যবস্থা করেছে, সেখানে সাংবাদিকরা ত্রোইর জীবনের শেষ মুহূর্তগুলোর যে সব ছবি তুলেছিল সেগুলো দেখান হয়েছে। অনেক দল আবার শহরের কেন্দ্র স্থলে ওর সম্মানে স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করেছে।

ভাবছি, একথা তুমি শুনেছ কি না। তারা একটা স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করেছে তাকাও সেতুর শেষ প্রান্তে, রিপাবলিকান ফুটবল মাঠের ফটকের বাইরে, আর একটা স্থাপন করেছে একেবারে চি হোয়া জেলখানার ভেতরে, এটা সত্যিই একটা রীতিমত বিস্ময়কর ব্যাপার।"

"মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্তদের ব্লকে যখন তুমি ত্রোইর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলে তখন তুমি নিজেই দেখেছ যে চি হোয়া জেলখানায় কী কড়া পাহারার ব্যবস্থা। তা সত্ত্বেও একদল তরুণ গোপনে জেলখানার চত্বরের মধ্যে ঢুকে পড়ে, আর শত্রুরা যেখানে ত্রোইকে একটা খুঁটির সঙ্গে বেঁধে গুলি করে হত্যা করেছিল ঠিক সেইখানে একটা স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করে আসে। এমন কি চলে আসবার আগে তারা স্মৃতিস্তম্ভটার একটা ফটোও তুলে আনে। অনেকেই যারা এই কথা শুনেছে তারা তাদের নিজেদের কানকে বিশ্বাস করতে পারেনি: চি হোয়ারই বধ্যভূমিতে একজন বিপ্লবী যোদ্ধার স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন, এ কি করে সম্ভব? কিন্তু পুলিশ নিজেই যখন স্বীকার করল তখন আর কেউই অবিশ্বাস করতে পারল না।"

"শত্রুরা ভেবেছিল ত্রোইকে হত্যা করে তারা আমাদের বিপ্লবী আন্দোলনকে দমিয়ে দিতে পারবে, কিন্তু ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়িয়েছে সম্পূর্ণ বিপরীত। সব কিছুই এখন আগের থেকে ভাল ভাবেই চলছে। আমাদের দলের প্রত্যেকটি সদস্য ত্রোইর হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্যে আমেরিকান আগ্রাসক ঘাতকদের খতম করবে বলে স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছে। নতুন সদস্য সংগ্রহ করার জন্যে আমাদের সাম্প্রতিক অভিযান আমরা যার নাম দিয়েছি 'ঙুয়েন ভ্যান ত্রোইর স্মৃতি তর্পন কর,' তাতে আশ্চর্য রকম সুফল পাওয়া গেছে। তাঁর সমস্ত কাজকর্ম, কথাবার্তা আর তাঁর জীবন-কাহিনী, কারাগারে যা তুমি আমায় বলেছিলে সে সবই আমার নিজের দলে আলোচনা এবং শিক্ষার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে।"

"ত্রোইর সম্মানে এই শ্রাদ্ধানুষ্ঠান হবার কথা যখন শুনলুম, তখন আমি এই ছোট্ট মেয়েটাকে কিছু ধূপ আর ফুল নিয়ে প্যাগোডায় যেতে বললুম আর তোমাকে এই চিঠিটা নিয়ে গিয়ে দিতে বললুম! আমি তোমাকে বলি ঃ এমন ভাবে জীবন যাপন করবার চেষ্টা কর যেন তুমি তোমার স্বামীর যোগ্য হতে পার। আমার কথা যদি বল তো আমি তোমাকে আমার যথাসাধ্য সাহায্য করব। তোমাকে আবার আমি চিঠি লিখব। আমার পরের চিঠিতে আমি তোমাকে এমনকিছু শোনাব, যা শুনে তুমি খুশী হবে।"

দ্বাদশ চান্দ্র মাসের ২৫শে তারিখে আমি আবার আমার স্বামীর সমাধি দেখতে গেলুম! এটা ছিল আমার ৮ম বা ৯ম বার দেখতে যাওয়া। বরাবরের মতই দু'জন পুলিশ গুপ্তচর আমাকে পায়ে পায়ে অনুসরণ করতে লাগল। কিন্তু আমি তাদের গ্রাহ্য করলুম না। সমাধির ওপর একটা ফুলের তোড়া রেখে ধূপ জালিয়ে দেবার পরেও আমি অনেক্ষণ সেখানে ঘোরা ফেরা করলুম। গুপ্তচর দু'টো অপেক্ষা করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়ল; তারপর তারা কাছাকাছি একটা সমাধি স্তূপের ওপর নজর রাখতে লাগল! কিন্তু সেই মুহূর্তে আমার মনের মধ্যে যে চিন্তা খেলে বেড়াচ্ছিল তা আর ওরা কি করে জানবে? পরের দিনই আমি সায়গন আর আমার স্বামী যেখানে শেষ বিশ্রাম লাভ করছে সেই স্থান ছেড়ে চলে যাব। পুলিশ আমার ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছিল—তার ফলে শহরের মধ্যে বিপ্লবী কাজকর্মে অংশ গ্রহণ করা আমার পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধাজনক ছিল। আমি সংকল্প স্থির করে ফেলেছিলুম—পরের দিনই মুক্ত অঞ্চলের পথ ধরব। যাতে আমার স্বামীর হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া হবে এরকম যে-কোন কাজের ভারই আমাকে দেওয়া হোক না কেন আমি তা সানন্দে গ্রহণ করব।

মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্তদের ব্লকে ওর সঙ্গে তৃতীয়বার দেখা করবার সময় শেষ মুহূর্তে ও আমাকে যা যা বলেছিল তার সবই পালন করব বলে আমি মনে শপথ নিলুম :

'দীর্ঘদিনের জন্যেও যদি আমাদের বিচ্ছেদ হয়, তাহলেও যাই ঘটুক না কেন শত্রুরা যেন তোমাকে ভয় পাওয়াতে না পারে। বিপ্লবে যোগ দেবার জন্যে যথা-সাধ্য চেষ্টা কোরো, আর তোমার কমরেডরা, যারা তোমার সহবন্দী ছিল তাদের উপদেশ আর পথনির্দেশ অনুসরণ করে চোলো।'

"আমি মনে মনে বললুম 'হ্যাঁ ত্রোই, জীবনে যে পথ তুমি বেছে নিয়েছিলে, তোমার নামে শপথ করছি, সেই পথ আমি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অনুসরণ করব"